সদা সর্বত্র
ইঞ্জিনিয়ার্স

আইএনটি/ ড্রাফটস্‌ম্যান ক্যাডার পুস্তিকা

১ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন

মূখবন্ধ

১। বিটিটি (বেসিক ট্রেড ট্রেনিং) ইঞ্জিনিয়ার কোরের সৈনিক পদবীর সৈনিকদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোর্স। এই কোর্স ল্যান্স কর্পোরাল পদবীর জন্য পূর্ব যোগ্যতা। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের একজন সৈনিকের জীবনে এটিই বাধ্যতামূলক বেসিক ট্রেড ট্রেনিং ভিত্তিক কোর্স। কারিগরি যোগ্যতার পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত পাঠ সমূহের সংকলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২। এই পুস্তিকাটি ইঞ্জিনিয়ার কোরের ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের সৈনিকদের কারিগরি যোগ্যতার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া এবং পরবর্তী পদে যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক পুস্তিকা হিসেবে কাজ করবে। এই পুস্তিকায় ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ সংযোজিত হয়েছে। ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের ছাত্রদের জন্য ইতিপূর্বে সংকলিত সহায়ক পুস্তিকার যোগ্যতানীতি অনুযায়ী কিছু কিছু বিষয়ের অভাব অনুভূত হওয়ায় এই পুস্তিকায় উক্ত বিষয়গুলি সংযোজন করে তৈরী করা হয়েছে। এই পুস্তিকা ছাত্রদের কারিগরী জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে বলে আশা পোষন করি।

৩। এই পুস্তিকার প্রকাশনায় বিভিন্ন ভূলত্রুটি থাকতে পারে। পুস্তিকাটি আরো মান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলের সুচিন্তিত মতামত ও নির্দেশনা একান্তকাম্য।

মুদ্রণঃ

মুদ্রণকারী করণিক	ঃ ১। কর্পোরাল রায়হান আহম্মেদ পিয়াস ২। সৈনিক মোঃ শরিফুল ইসলাম
প্রণয়নকারী এনসিও	ঃ সার্জেন্ট মোঃ শাহাদাৎ হোসেন
প্রণয়নকারী জেসিও	ঃ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমীন
নিরীক্ষাকারী অফিসার	ঃ মেজর আবু হেনা মোঃ কাওসার জাহান
প্রধান পৃষ্টপোষক	ঃ লেঃ কর্ণেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি অধিনায়ক, ১ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন

আপডেটঃ ১৭-০৯-২০২৪

সূচীপত্র

বিটিটি-ড্রাফটস্‌ম্যান

ক্র/নং	পাঠ্য বিষয়	পৃষ্ঠা	
		হতে	পর্যন্ত
১।	একজন ভাল ড্রাফটস্‌ম্যান এর গুনাবলী	০১	০১
২।	ড্রাফটস্‌ম্যান শপে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নাম, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ	০২	০৫
৩।	ষ্ট্যাপলার মেশিন সম্পর্কে ধারণা	০৬	০৮
৪।	স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন সম্পর্কে ধারণা	০৯	১০
৫।	লেমিনেটিং মেশিন সম্পর্কে ধারণা	১১	১২
৬।	নোটবুক তৈরী ও রেজিষ্টার বাধাঁই	১৩	১৩
৭।	কম্পিউটার এর পরিচিতি ও এর ব্যবহার	১৪	২৬
৮।	বাংলা অক্ষর লিখন পদ্ধতি (ব্লক, ফ্ল্যাট, ন্যারো)	২৭	৩৪
৯।	ইংরেজি অক্ষর লিখন পদ্ধতি (ব্লক, ফ্ল্যাট, ন্যারো)	৩৫	৩৮
১০।	ষ্টেনসিল কাটার পদ্ধতি	৩৯	৪০
১১।	কর্কশীট এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ , প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্ম্পকে আলোচনা	৪১	৪২
১২।	কর্কশীটের বিভিন্ন প্রকার লেখা সম্পর্কে আলোচনা ও কাটার পদ্বতি	৪৩	৪৩
১৩।	ড্রইং , ড্রইং এর প্রকারভেদ ও বর্ণনা	৪৪	৪৪
১৪।	বক্স পেপার দিয়ে বক্স তৈরী ও র‍্যাপিং করা	৪৫	৪৫
১৫।	আলপনা তৈরীকরন	৪৬	৪৭
১৬।	ম্যাপের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য, উদ্ধাংশ, নিম্নাংশ, সীমাবদ্ধতা, যত্ন ও রক্ষনাবেক্ষণ	৪৮	৪৯
১৭।	ম্যাপের গ্রিড লাইনের সংজ্ঞা ও মিলিটারী গ্রিড সিস্টেম লক্ষ্যবস্তুর স্থানাংক নির্ণয়	৫০	৫২
১৮।	ম্যাপের নির্ঘন্ট	৫৩	৫৫
১৯।	মডেলের পরিচিতি ও বর্ণনা	৫৬	৫৭
২০।	ক্লথ মডেলের পরিচিতি ও বর্ণনা	৫৮	৫৯
২১।	সেন্ড মডেলের পরিচিতি ও বর্ণনা	৬০	৬১
২২।	জিপিএস এর সংজ্ঞা, পরিচিতি ও ব্যবহার প্রণালী	৬২	৬৬
২৩।	প্রতিরক্ষায় দূরত্ব নির্ণয় ও নকশা অংকন	৬৭	৬৯
২৪।	কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র	৭০	৭৪
২৫।	সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর ও রোমার	৭৫	৭৬
২৬।	চাক্ষুষ নকশা ও স্মৃতি নকশা তৈরি	৭৭	৭৮
২৭।	নাইট মার্চ চার্ট তৈরী করণ ও এর ব্যবহার	৭৯	৮৪
২৮।	মানচিত্র এর চাহিদা, সংগ্রহ ও জমা করার নিয়মাবলী	৮৫	৮৭
২৯।	সাংকেতিক চিহ্নের বর্ণনা ও অংকন	৮৮	৯৯
৩০।	সামরিক প্রতীকের বর্ণনা ও অংকন	১০০	১১৩
৩১।	ম্যাপ মার্কিং পদ্ধতি ও মার্কিং করন	১১৪	১১৫
৩২।	ওভার লে প্রস্তুত করন	১১৬	১১৮
৩৩।	ম্যাপ সম্প্রসারণ	১১৯	১২১
৩৪।	কমান্ডপোষ্ট	১২২	১২৪
৩৫।	ভাল প্রশিক্ষকের জন্য দক্ষতা অর্জন	১২৫	১২৯
৩৬।	বিবিধ	১৩০	১৩১

একজন ভাল ড্রাফটস্‌ম্যান এর গুনাবলী

১। **ভূমিকাঃ** যেহেতু আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের সদস্য সেহেতু আমাদেরকে একজন ড্রাফটস্‌ম্যান এর গুনাবলী সম্পর্কে জানা একান্ত দরকার। কারণ ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন উভয় ক্ষেত্রে ড্রাফটসম্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব একজন ভাল ড্রাফটস্‌ম্যান এর গুনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের কর্তব্য।

২। **একজন ভাল ড্রাফটস্‌ম্যান এর গুনাবলী।**

ক। ধৈর্য্যশীল ও সহনশীল হতে হবে।
খ। কাজে পারদর্শী হতে হবে।
গ। সদা সর্বদা হাসি ও খুশি থাকতে হবে।
ঘ। পেন্সিলের দাগ হালকা ভাবে টানতে হবে।
ঙ। কালির কাজ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
চ। কালির কাজ করার পর পেন্সিলের দাগ মুছে দিতে হবে।
ছ। কালির কাজ করার পর কাজটি পূণরায় চেক করতে হবে। যাতে কোন কিছু বাদ পড়ে না যায়।
জ। একসাথে একাধিক কাজ আসলে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ করতে হবে।
ঝ। কাজ শেষে সকল সরঞ্জাম স্ব স্ব স্থানে রাখতে হবে।

ড্রাফটস্‌ম্যান শপে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নাম, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ

১। **ভূমিকাঃ** বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ার কোরের মোট ১৮টি ট্রেড বিদ্যামান। এই ১৮টি ট্রেডের প্রত্যেকটিই ইঞ্জিনিয়ার কোরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেড ইঞ্জিনিয়ার কোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শান্তিকালীন সময়েই এই ট্রেডধারী অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার কোরের প্রতিটি সদস্য একজন ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার। ইংরেজিতে Engineer শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন ingenium শব্দ হতে যার অর্থ হচ্ছে চতুরতা বা বুদ্ধি ইঞ্জিনিয়ার্স এর উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পারিপার্শ্বিক প্রাপ্ত সম্পদ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারকরে সুচারুরুপে সমাধা করাই হচ্ছে এই কোরের বৈশিষ্ট। সৈনিকদের ট্রেড তাদের একটি বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা নির্দেশ করে। ট্রেডধারীগণ নিজ ট্রেডের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কাজে সমাধা করতে সাহায্য করে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন হবে তখন ট্রেডধারীগণ তাদের সুনিপন দক্ষতা দ্বারা সমাধান করতে হবে। সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামোর অবস্থান হিসাবে সকলে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, শান্তিকালীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সকল প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা দুরুহ আর তা বিশেষভাবে কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের ক্ষেত্রে দুরুহতর। আর তাই যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রত্যেক ট্রেডধারীকে তার ট্রেডের সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন।

২। **ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের কাজঃ** ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের কাজ এতই ব্যাপক যে, সুনির্দিষ্ট করা না গেলে সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তদুপরি ট্রেডের প্রত্যেকটি কাজই সূক্ষ পরিকল্পনার মাধ্যমে করায় একজন ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডধারীদের সার্থকতা।

৩। **টুলস এর সংজ্ঞাঃ** একজন কারিগর তাহার উপর অর্পিত দায়িত্বকে সুনিপুনভাবে সমাধান করার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে তাহাকে টুলস বলে।

৪। **টুলসের প্রকারভেদঃ** টুলস প্রধানত দুই প্রকার। যেমনঃ

ক। হ্যান্ড টুলস।
খ। মেশিন টুলস।

৫। **হ্যান্ড টুলসঃ** একজন উৎপাদন মূখী কারিগর যে সমস্ত টুলস ব্যবহার করে তার কাজ সমাধান করে তাকে হ্যান্ড টুলস বলে।যেমনঃ

ক। ড্রইং টেবিল।
খ। এ্যান্টিকাটার।
গ। কেচি।
ঘ। স্কেল (বিভিন্ন সাইজ)
ঙ। হ্যামারও প্লাস।
চ। মিনি ষ্ট্যাপলার মেশিন।
ছ। হেভী ষ্ট্যাপলার মেশিন।
জ। লং ষ্ট্যাপলার মেশিন।
ঝ। গান সুটার।
ঞ। সেটস্কয়ার।
ট। টি সেট।
ঠ। স্কচটেপ ডিসপেনসার।
ড। রাউন্ড টেমপ্লেট।

ঢ। ষ্ট্যাপলার পিন রিমোভার।
ণ। ম্যাপ ক্লিপ।
ত। কর্কশীট কাটার।
থ। ডাষ্টার।
দ। মেজারমেন্ট টেপ।
ধ। গুজেক
ন। পাঞ্চিং মেশিন
প। গ্লু-গান মেশিন

৬। **মেশিন টুলসঃ** যে সমস্ত টুলস মেকানিক্যাল শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে কার্য সম্পন্ন করে তাহাকে মেশিন টুলস বলে। নিম্নবর্ণিত টুলসগুলি মেকানিক্যাল শক্তি দ্বারা চালিত হয়। যেমনঃ

ক। কম্পিউটার/ ল্যাপটপ।
খ। প্রিন্টার।
গ। প্রজেক্টর।
ঘ। ক্যামেরা।
ঙ। ড্রোন ক্যামেরা।
চ। জি পি এস।
ছ। কম্পাস।
জ। স্পাইরাল মেশিন।
ঝ। লেমিনেটিং মেশিন।

৭। **ব্যবহারকৃত দ্রব্যসামগ্রীঃ** ব্যবহারকৃত দ্রব্যসামগ্রী নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ যেমন-

ক। ড্রইং সীট (বিভিন্ন কালার)
খ। বক্সবোর্ড পেপার।
গ। পোষ্টার পেপার।
ঘ। গ্লুসি পেপার।
ঙ। এ্যাম্বুস পেপার।
চ। ট্রেসিং পেপার।
ছ। এ্যাক্সারসাইজ পেপার।
জ। রিফ্লেক্টিভ পেপার।
ঝ। সেলোপিং পেপার।
ঞ। মনোগ্রাম যুক্ত রেপিং পেপার।
ট। সিভিল রেপিং পেপার।
ঠ। লেমিনেটিং পেপার।
ড। স্পাইরাল সীট।
ঢ। স্পাইরাল রিং (বিভিন্ন সাইজ)।
ণ। ফেবিকল গাম ।
ত। আইকা গাম।
থ। সলিউশন গাম।
দ। গ্লু স্টিক।
ধ। ট্যাঙ্ক পেপার।

ন। মিল্ক পেপার।
প। পয়েন্টার স্টিক।
ফ। লেজার লাইট।
ব। স্লাইট চেইঞ্জার।
ভ। বোর্ড পিন।
ম। থ্রেট বল।
য। চক।
র। বিভিন কালার রিবন।
ল। প্লাস্টিক পেইন্ট।
শ। তুলি-ব্রাশ।
ষ। বিভিন্ন কালার জরি।
স। এ্যান্টিকাটার বেলেট।
হ। আর্ট লাইন মার্কার।
ড়। ও এইচ পি মার্কার (সলিবল)।
ঢ়। ও এইচ পি মার্কার (পার্মানেন্ট)।
য়। সিডি/ ডিভিডি মার্কার।

<u>বিভিন্ন উপাদান/ উপকরনের বর্ণনা ঃ</u>

ক। <u>ড্রইং টেবিলঃ</u> ইহার উপর ড্রইং সীট সেটিং করিয়া ড্রইং করা হয় এতে একটি প্লাষ্টিকের বার রয়েছে যা উপরে এবং নীচে সমান্তরাল করে দাগ টানা ও বাংলা ইংরেজি লেখা সহজে লেখা যায়।

খ। <u>ড্রই সীটঃ</u> ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার লেখা ড্রইং করা, নোট বুক তৈরী, ড্রাফট প্যাড ও বিভিন্ন বই এর কভার লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ। <u>সেট স্কয়ারঃ</u> ইহা দ্বারা ৩০ ডিগ্রী, ৪৫ ডিগ্রী ও ৬০ ডিগ্রী দাগ দেয়া যায় এবং ড্রইং করা ও বাংলা এবং ইংরেজি লেখার দাগ টানতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ঘ। <u>স্পাইরাল মেশিনঃ</u> আমরা জানি স্পাইরাল মেশিন দুই ধরনের পাওয়া যায় যথা কম্বো টাইপ এবং রিং টাইপ। ইহা এমন ধরনের মেশিন যাহার সাহয্যে ভিআইপি নোট বুক, ব্রিফিং এর বই এবং গুরুত্বপূর্ণ বই গুলোকে স্পাইরাল বাইন্ডিং করা হয়।

ঙ। <u>লেমিনেটিং মেশিনঃ</u> ইহা এমন ধরনের মেশিন যাহার সাহায্যে কোন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, গুরুত্বপূর্ণ ছবি সহ, গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট লেমেনেটিং করে দীর্ঘদিন যত্ন সহকারে রাখা যায়।

চ। <u>হেভী স্ট্যাপলার মেশিনঃ</u> ইহার সাহায্যে বিভিন্ন নোট বুক ও বই বাঁধাই এর কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছ। <u>টি সেটঃ</u> ইহা দেখতে ইংরেজি অক্ষর টি এর মত। ইহার সাহায্যে ড্রইং এর কাগজে সোজা করে দাগটানা যায়। তাছাড়াও যখন কোন মিল্ক পেপারে এনলার্জমেন্ট করে থাকি তখন আমরা টি সেট ব্যবহার করে থাকি।

জ। <u>সার্ভিস প্রট্র্যাক্টরঃ</u> ইহার সাহায্যে ম্যাপের মধ্যে ০ থেকে ৩৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত পড়া যায়। সাধারণত নাইট মার্চ চার্ট তৈরী করতে ইহা ব্যবহার করা হয়।

ঝ। <u>ড্রইং বক্সঃ</u> ইহা এমন একটি বক্স যাতে ড্রইং করার সকল সরঞ্জাম রয়েছে।

ষ্ট্যাপলার মেশিন সম্পর্কে ধারণা

১। **ভূমিকাঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশলী বিভাগের ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের সৈনিক হিসাবে ড্রাফটস্‌ম্যান শপে ব্যবহৃত টুলস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। ড্রাফটস্‌ম্যান শপে ব্যবহৃত টুলস ষ্ট্যাপলার মেশিন একটি গুরুত্বপূর্ণ টুলস। ষ্ট্যাপলার শব্দটি ইংরেজি শব্দ এর অর্থ আলতারাপ কাগজ বাধাই যন্ত্র। ইহা এমন একটি টুলস বা হস্ত চালিত যন্ত্র যার সাহায্যে কাগজ আটকানো হয়।

২। **ষ্ট্যাপলার মেশিনঃ** ইহা এমন একটি যান্ত্রিক ডিভাইস যা সীট বা কাগজের মধ্যে একটি পাতলা ধাতব পদার্থ চালনা করে এবং শেষ প্রান্ত গুলি ভাঁজ করে কাগজ বা কাগজের অনুরুপ উপাদানের পৃষ্ঠাগুলোকে একত্রে সংযুক্ত করে।

৩। **ষ্ট্যাপলার এর ব্যবহারঃ** ১৮৬৬ সালে জর্জ ম্যাকগিল একটি ছোট ষ্ট্যাপলার আবিস্কারকরেন। বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে ও ব্যাপক ব্যবহৃত হয়।

৪। **ষ্ট্যাপলার এর প্রকারভেদ ঃ**

পাওয়ার বা ধরনের উপর ভিত্তি করে ষ্ট্যাপলার ০২ প্রকার। যথাঃ
ক। ইলেকট্রিক ষ্ট্যাপলার মেশিন।
খ। হস্ত চালিত ষ্ট্যাপলার মেশিন।

সাইজ বা আকার আকৃতির উপর ভিত্তি করে ষ্ট্যাপলার ০৩ প্রকার। যথাঃ
ক। মিনি ষ্ট্যাপলার মেশিন।
খ। হেভী ষ্ট্যাপলার মেশিন।
গ। লং ষ্ট্যাপলার মেশিন।

ক। **মিনি ষ্ট্যাপলার মেশিনঃ** এটি মুলত ছোটআকৃতির ষ্ট্যাপলার মেশিন, যা সাধারণত দৈনন্দিন দপ্তরিক (অফিসিয়াল) কাজে ব্যবহার হয়। ইহা সাধারণত ২-২৫ পৃষ্ঠা বাধাঁই কাজে ব্যবহার হয়। উক্ত ষ্ট্যাপলার মেশিনে ২৪/৬ সাইজের পিন ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ মিনি ষ্ট্যাপলার মেশিন

খ। <u>হেভী ষ্ট্যাপলার মেশিনঃ</u> এটি মুলত বড় আকৃতির ষ্ট্যাপলার মেশিন, যা সাধারণত বড় ধরনের বই বাঁধাই, নোটবুক ও ড্রাফট প্যাড তৈরী ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। উক্ত ষ্ট্যাপলার মেশিনে বিভিন্ন সাইজের পিন ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ হেভী ষ্ট্যাপলার মেশিন

গ। <u>লং ষ্ট্যাপলার মেশিনঃ</u> এটি মূলত লম্বা আকৃতির ষ্ট্যাপলার মেশিন, যা সাধারণত পরীক্ষার খাতা, বই বাধাঁই, ম্যাপ জোড়াসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। উক্ত ষ্ট্যাপলার মেশিনে বিভিন্ন সাইজের পিন ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ লং ষ্ট্যাপলার মেশিন

খ। সুটার গান মেশিনঃ এটি মূলত মাঝারি আকৃতির ষ্ট্যাপলার মেশিন, যা সাধারণত বিভিন্ন হার্ড বোর্ড , পিভিসি বোর্ড এবং কাঠের ফ্রেমে পেনাফ্রেক্স ও বিভিন্ন আর্ট পেপার লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটির মাধ্যমে খুব দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে কাজ করা যায়। উক্ত সুটার গান মেশিনে বিভিন্ন সাইজের পিন ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ সুটার গান মেশিন

৫। **বিভিন্ন সাইজের পিনঃ**

Size	Staple
23/6-24/6	6 mm
23/8-24/8	8 mm
23/10-24/10	10 mm
23/13-24/13	13 mm
23/15-24/15	15 mm
23/17-24/17	17 mm
23/20-24/20	20 mm
23/23-24/23	23 mm
23/24-24/24	24 mm

স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন সম্পর্কে ধারণা

১। **ভূমিকাঃ** স্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন অফিস আদালতে বা প্রতিষ্ঠানে খাতা, বই, নোটবুক বাধাঁনোর কাজে স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন বহুল ব্যবহৃত। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন এর মাধ্যমে ক্যালেন্ডার, বই, নোটবুক, খাতা বাধাই করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেআসছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বই, খাতা, নোটবুক বাধাই করার জন্য স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ড্রাফটস্ম্যান শপের বিভিন্ন টুলসের মধ্যে স্পাইরাল বাইডিং মেশিন অন্যতম। তাই একজন ড্রাফটস্ম্যান ট্রেডের সৈনিক হিসাবে এই মেশিন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

২। **স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিনঃ** ইহা এমন এক ধরনের মেশিন যাহার সাহায্যে নোটবুক, খাতা, বই অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর ভাবে মজবুত করে তৈরী করা যায়। অন্যান্য ভাবে বই, খাতা নোটবুক বাধাঁই করা হলেও এই মেশিনের সাহায্যে বই, খাতা, নোটবুকের সৌন্দর্য বিকশিত হয়।

৩। **প্রকারভেদঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে দুই ধরনের স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন সচারাচর ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ

ক। কম্ব টাইপ।

খ। কয়েল টাইপ।

চিত্রঃ কম্ব টাইপ স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন

৪। **কম্ব টাইপ ম্যানুয়াল এর কার্যপদ্ধতিঃ** প্রথমে মেশিনটি ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। তারপর একটি কাগজ পেপারওয়ে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেখতে হবে কাগজ সঠিক জায়গায় ছিদ্র হচ্ছে কিনা। যদি না হয় তাহলে বামে থাকা রিমুভিং নবকে ডানে বামে সরিয়ে সেট করতে হবে। মেশিনে ২১ টি ছিদ্র হয়। ঠিক হওয়ার পর যে পরিমান কাগজ বাধাঁই করতে হবে তা সমান করে নিতে হবে। এরপর সমানকৃত কাগজকে ছিদ্র করার জন্য পেপারওয়ে দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। মেশিনের ডান পার্শ্বে থাকা হাতল নিচের দিকে চাপ দেই এবং উপরে উঠাই। প্রথম কাগজ গুলো ছিদ্র হয়ে গেলে, এবার একটি কম্ব পাইপ নিয়ে উপরে ক্লিপে বসানোর পর বাম পাশের থাকা হাতলকে নিচের দিকে টানলে কাগজ দেওয়ার জন্য জায়গা তৈরী হবে। সেখানে কাগজ গুলো ছিদ্র অনুযায়ী বসিয়ে হাতলকে উপরে টানতে হবে। এখন নোট বা বইটি বাধাঁই হয়ে গেল।

চিত্রঃ কয়েল টাইপ স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন

৫। **<u>কয়েল টাইপ ম্যানুয়াল এর কার্যপদ্ধতিঃ</u>** এই রিং টাইপ স্পাইরাল গুলো তারের রিং এর সাহায্যে করা হয়ে থাকে। ইহা অনেকটাই কম্বো টাইপ স্পাইরাল মেশিন এর মতই ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে এই মেশিনটি বিদ্যুতের সাহায্যে ও ব্যবহার করা যায়।এই মেশিনে সর্বমোট ৪৬ টি ছিদ্র থাকে।

৬। **<u>উপসংহারঃ</u>** আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের সৈনিক হিসাবে স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত পরিহার্য।

লেমিনেটিং মেশিন সম্পর্কে ধারণা

১। লেমিনেটিংঃ লেমিনেটিং বা লেমোনেশন হলো একাধিক স্তর গুলিতে একটি উৎপাদন করার কৌশল যা প্রক্রিয়া যাতে সংমিশ্রিত উপাদানগুলো প্লাষ্টিকের মত পৃথক উপকরন গুলির ব্যবহার থেকে উন্নত শক্তি, স্থায়িত্ব, শব্দ নিররোধ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট অর্জন করে। অর্থাৎ কোন ডকুমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পত্র বা ছবি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্লাষ্টিকের আবরন দ্বারা শক্ত করে মুড়ে দেয় এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সেটিকে বাঁচানোর জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাকেই লেমিনেটিং বলে।

২। লেমিনেটিং পেপার সম্পর্কে আলোচনাঃ আমরা সাধারণত যে লেমিনেটিং মেশিন ব্যবহার করি সেটি সাধারণত অনেক ধরনের লেমিনেটিং পেপার সাইজ এর আছে। একটি লেমিনেটিং মেশিন দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পেপার ব্যবহার করতে পারি। কাজের গুরুত্ব এবং মাপ বুঝে আমরা লেমিনেটিং পেপার ব্যবহার করে থাকি। আমরা সাধারণত যে কয় প্রকার লেমিনেটিং পেপার ব্যবহার করি তা নিম্নরুপ। যেমনঃ

ক। আইডি কার্ড সাইজ।
খ। ৩ আর সাইজ(3 R Size)।
গ। ৪ আর সাইজ(4 R Size)।
ঘ। ৬ আর সাইজ(6 R Size)।
ঙ। ৭ আর সাইজ (7 R Size)।
চ। এ-৮ সাইজ (A-8 Size)।
ছ। এ-৩ সাইজ (A-3 Size)।

৩। লেমেনিটিং এর প্রয়োজনীয়তাঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লেমেনিটিং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। তাই আমাদেরও জীবন যাত্রায় আধুনিকতার ছোয়া পড়েছে। আমরা আমাদের কোন বস্তুটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা জানি। জীবনে চলতে হলে বিভিন্ন প্রকার কাগজ পত্র স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। আর সেটা করতে হলে আমাদের স্থায়ীভাবে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় সেটা করতে হলে অবশ্যই লেমিনেটিং করতে হবে। যেমনঃ স্কুল কলেজ এর সার্টিফিকেট, ভোটার আইডি কার্ড, জন্ম নিবন্ধন ছবি স্থায়ী অস্থায়ী ভাবে লেমিনেটিং এর মাধ্যমে আমরা সংরক্ষণ করে রাখি এছাড়াও সেনাবাহিনীতেও আমাদের অনেক দক্ষতা সার্টিফিকেট এবং প্রয়োজনীয় অনেক কিছু লেমিনেটিং এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখি। সেনাবাহিনীতে আমরা বিভিন্ন প্রকার স্থায়ী অস্থায়ী স্টিকার লেমিনেটিং এর মাধ্যমে তা ব্যবহারকরে থাকি। তাই লেমিনেটিং এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। লেমিনেটিং মেশিন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাঃ লেমিনেটিং মেশিন সম্পর্কে আমরা অবশ্যই কম বেশি জানি। এটা মূলত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টকে একটি প্লাষ্টিক আবরন দ্বারা মুড়ে দেয় এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সেটিকে বাচিয়ে রাখে।

৫। একটি লেমিনেটিং মেশিন এর ব্যবহারঃ একটি লেমিনেটিং মেশিন বিভিন্ন স্প্রিডের হতে পারে তবে স্বাভাবিক স্প্রিড হল-৩। আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মত স্প্রিড কন্টোল করে নিতে পারেন। লেমিনেটিং মেশিনের তাপমাত্রা সাধারণত ১১০ থেকে ১২০ পর্যন্ত লেমিনেটিং করে থাকি। কিছু কিছু মেশিনে এর চেয়ে অধিক তাপমাত্রায় হয়ে থাকে।

৬। লেমিনেটিং মেশিনে কাজের ধরন বা নিয়মঃ বিভিন্ন লেমিনেটিং মেশিনে বিভিন্ন সাইজের পেপার হতে পারে। তবে বেশির ভাগক্ষেত্রে মেশিনের কাগজের সাইজ ৩০০×৩০০ মিঃ মিঃ থেকে ১১০০×১২০০ মিঃ মিঃ পর্যন্ত কাগজ ব্যবহার করে থাকি।

চিত্রঃ লেমিনেটিং মেশিন

লেমিনেটিং মেশিন ব্যবহার এর নিয়ম বা সর্তক করণঃ

আমরা কোন জিনিস ব্যবহার করার আগে অবশ্যই তার ব্যবহার বিধি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। লেমিনেটিং মেশিন একটি ইলেকট্রনিক মেশিন তাই এর ব্যবহার অত্যন্ত সর্তকতার সাথে করতে হবে। লেমিনেটিং মেশিনের নিয়মাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ক। প্রথমে লেমিনেটিং মেশিনে পাওয়ার মুড অন করতে হবে।

খ। সাব পাওয়ার মুড অন করতে হবে

গ। সুইচ ঘুরিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তাপমাত্রা সেটিং করতে হবে। তবে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১১০ থেকে ১২০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

ঘ। অটো/নরমাল মুড অন করতে হবে ।

ঙ। লেমিনেটিং শুরুর আগে মেশিন হিট হয়েছে কিনা চেক করে নিতে হবে।

চ। মেশিন কাজের জন্য প্রস্তুত হলে সবুজ আলো জ্বলে উঠবে। তখন বুঝতে হবে লেমিনেটিং করার জন্য মেশিনটি প্রস্তুত হয়েছে।

ছ। লক্ষ্য রাখতে হবে মেশিন বেশি হিট হলে তা কাজ শুরুর আগে চেক করে নেওয়া ভালো এবং মেশিন যদি বেশি হিট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মেশিনে পুরাতন লেমিনেটিং পেপার বা মোটা কাগজ দিয়ে মেশিনের হিট স্বাভাবিক করতে হবে।

জ। অধিক সময় কাজ করার পর মেশিনে অতিরিক্ত হিট হয়ে যেতে পারে তখন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রীতে নামিয়ে আনতে হবে।

ঝ। লেমিনেটিং করা শেষ হলে সাথে সাথে মেশিনটির পাওয়ার বন্ধ করা যাবে না। মেশিনের তাপমাত্রা ঠান্ডা হওয়ার পর পাওয়ার সুইচ বন্ধ করতে হবে।

ঞ। চালু অবস্থায় বা লেমিনেটিং করা অবস্থায় খালি হাতে মেশিনে হাত দেওয়া যাবে না।

চ। লেমিনেটিং এর কাজ শেষ হওয়ার পর অবশ্যই মেশিন ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে এবং পরিষ্কার করার পর কাপড় বা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

নোটবুক তৈরী ও রেজিষ্টার বাধাঁই

১। **ভূমিকাঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশলী বিভাগের ড্রাফটস্ম্যান ট্রেডের সৈনিক হিসাবে ট্রেডের কাজের দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। ড্রাফটস্ম্যান শপে প্রাথমিক কাজের মধ্যে নোট বুক ও রেজিষ্টার বাধাঁই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২। **নোট বুকঃ** নোটবুক হলো কাগজের তৈরী এমন একটি দ্রব্য যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সদস্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে সকল গুরুত্বপূর্ণ আদেশ নির্দেশ এবং নিত্য দিনের কার্যক্রম নোট করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তা দেখে অধিনস্তদের অবগত করা এবং সকল কাজ সুন্দরও সঠিকভাবে করা হয় তাকেই নোট বুক বলা হয়।

৩। **নোট বুকের প্রকারভেদঃ** নোটবুক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তার মধ্যে নিম্নলিখিত ০২ প্রকার নোটবুক আমরা সচরাচর ব্যবহারকরে থাকি। যথাঃ

ক। পকেট নোটবুক।
খ। হ্যান্ড নোটবুক।

৪। **নোটবুক তৈরীর পদ্ধতিঃ** নোটবুক তৈরী করার জন্য প্রথমে কাগজ নিতে হবে, ১টি কাগজকে ৪ ভাগে ভাজ করে নিয়ে পুনরায় কাগজটি সমান করলে ৪টি ভাগ দেখা যাবে, এই কাগজটি বাকি নোটবুকের কাগজ গুলোর উপরে সমান করে রেখে প্রথমে দ্বিখন্ডিত তারপর কাগজ গুলোকে একত্র করে আবার দ্বিখন্ডিত করলে নোইবুকের সাইজ অনুযায়ী কাগজ কাটা হয়ে যাবে, এরপর নোটবুকের সাইজ অনুযায়ী ড্রইংসীট কেটে কভার পেইজ তৈরী করে নিতে হবে এরপর কাগজগুলোকে সমান করে উপরের অংশে হেভী ষ্ট্যাপলার মেশিন দিয়ে পিন মারতে হবে। তারপরউপরের অংশে ২/১ ইঞ্চি পরিমান পেন্সিল দ্বারা লাইন টেনে বাইন্ডিং টেপ মারতে হবে এবং এন্টিকাটার দিয়ে নোট বুকটিকে সমান করার জন্য প্রয়োজনীয় সাইটগুলো কাটতে হবে। পরিশেষে নাম এবং ট্যাল্ক শীট লাগাতে হবে। একটি আদর্শ নোট বুকের সাইজ ৪ ইঞ্চি/৬ ইঞ্চি।

৫। **রেজিষ্টার বাধাঁই করার পদ্ধতিঃ** রেজিষ্টার বাধাঁই করার জন্য প্রথমে পোষ্টার পেপার নিতে হবে। একটি পোষ্টার পেপারে ০২ টি রেজিষ্টার বাধাঁই করা যায়। প্রথমে পোষ্টার পেপারটিকে সমানকরে দ্বিখন্ডিত করে নিতে হবে। রেজিষ্টারের দুই প্রান্তে পোষ্টাল পেপার ভাজ করে গাম দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর কেচি দ্বারা চার কোনা কেটে নিয়ে বাকী অংশগুলো গাম দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর রেজিষ্টারের উপরের পাশের ঠিক মাঝখানে রেজিষ্টারের নাম লাগিয়ে ট্যাল্ক সীট লাগাতে হবে।

৬। **উপসংহারঃ** আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে ড্রাফটস্ম্যান ট্রেডের সৈনিক হিসাবে নোটবুক এবং রেজিষ্টার বাধাঁই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত অপরিহার্য।

কম্পিউটার এর পরিচিতি ও এর ব্যবহার

১। **ভূমিকাঃ** বর্তমানে পুরো পৃথিবী কিন্তু ধীরে ধীরে ডিজিটালাইজ হচ্ছে তাই আজকের দিনে একজন সাধারণ মানুষেরও Basic Computer সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী, তা না হলে আপনি এই ডিজিটাল যুগে সমাজের মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়তে পারেন।

২। **কম্পিউটার কিঃ** কম্পিউটার হচ্ছে এক ধরনের প্রোগ্রামেবল (Programmable) ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট হিসেবে ডাটা গ্রহণ করে এবং সেই ডাটা কে পূর্বনির্ধারিত নির্দেশাবলী অনুসারে প্রসেস করে এবং নির্ভুল হিসেবে আউটপুট প্রদান করে। কম্পিউটার (Computer) শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। কিন্তু এখন আর কম্পিউটারকে শুধু গণনাকারী যন্ত্র বলা যায় না। কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা তথ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে।

৩। **কম্পিউটার কাকে বলেঃ** যে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বা ডাটা ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ভুল ফলাফল আউটপুট হিসেবে প্রদান করে তাকে কম্পিউটার বলে।

৪। **কম্পিউটার এর পুরো নামঃ** Computer এর পূর্ণরূপ হল "Commonly Operated Machine Particularly Used in Technical and Educational Research"

৫। **কম্পিউটারের জনক কে ঃ** ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) কে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

৬। **কম্পিউটার কিভাবে কাজ করেঃ** কম্পিউটার মূলত চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পন্ন করে।

ক। Input.
খ। Storage.
গ। Processing.
ঘ। Output.

প্রথমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারকে ইনপুট দেয়, ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যম যেমন- মাউস, কীবোর্ড ইত্যাদি। তারপর ইনপুটকৃত ডাটা গুলি স্টোরেজ ডিভাইস এ সেইভ হয়। তারপর প্রসেসর সমস্ত ডাটাগুলি প্রসেসিং করে এবং সর্বশেষ আউটপুট ডিভাইস যেমন- মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার, প্রজেক্টর ইত্যাদির মাধ্যমে ফলাফল আমাদেরকে প্রদান করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা কোন কমান্ড বা ইনপুট কিবোর্ড এর মাধ্যমে দেই তখন মাউস সে কমান্ড বা নির্দেশকে ০ এবং ১ রূপে মাদারবোর্ডে পাঠায়, মাদারবোর্ড সেই নির্দেশকে ভেরিফাই করে প্রাইমারি মেমোরি যেমন- র‍্যাম এ জমা করে রাখে। তারপর ০ এবং ১ নির্দেশ গুলি সিপিইউ অর্থাৎ প্রসেসিং ইউনিটে যায়, এরপর প্রসেসিং ইউনিট সেই ডাটাগুলি প্রসেসিং করে আউটপুটের মাধ্যমে আমাদেরকে ফলাফল দেখায়, এভাবেই মূলত একটি কম্পিউটার কাজ করে থাকে।

৭। **কম্পিউটারের কাজ (Function of Computer)ঃ** কম্পিউটারের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ক। সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহারকারী দ্বারা তৈরী প্রোগ্রাম কম্পিউটার গ্রহণ করে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে এবং ব্যবহারকারীর নির্দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্বাহ করে।
খ। কিবোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, ডিস্ক ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ডেটা গ্রহণ করে।
গ। ডাটা প্রক্রিয়াকরণ করে।

ঘ। মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ফলাফল প্রকাশ করে।

৮। **কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যঃ**

ক। দ্রুতগতি।
খ। নির্ভুলতা।
গ। সক্ষমতা।
ঘ। বিশ্বাসযোগ্যতা।
ঙ। ক্লান্তিহীনতা।
চ। স্মৃতিশক্তি।
ছ। স্বয়ংক্রিয়তা।
জ। যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত।
ঝ। বহুমুখিতা।
ঞ। অসীম জীবনীশক্তি।

৯। **র‍্যাম (RAM) ঃ** RAM (Random Access Memory) হল এমন একটি মেমরি যা ক্ষনস্থায়ী, অর্থাৎ যতক্ষন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে ততক্ষণ মেমরি থাকবে । বিদ্যুত প্রবাহ না থাকলে এইটা থাকবে না । এইটা কে অনেকটা মানুষের স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

১০। **কম্পিউটার দিয়ে কাজ করার সুবিধাঃ** কম্পিউটার দিয়ে কাজ করার অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যথা-

ক। কম্পিউটার খুব দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারে।
খ। নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যায়।
গ। মেমোরিতে অনেক তথ্য সেইভ করে রাখা যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
ঘ। স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করে থাকে।
ঙ। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
চ। ডাটা প্রসেসিং এর মাধ্যমে ডাটা বিশ্লেষণ করতে পারে।
ছ। কল্পনাহীন ভাবে টানা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারে।

১১। **বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহারঃ**

ক। ওয়ার্ড প্রসেসিং বা লেখালেখির কাজে টাইপরাইটারের বিকল্প হিসেবে অফিস আদালতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।
খ। ব্যাংকিং, শেয়ার বাজার ও ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের হিসাব তৈরী ও সংরক্ষণের কাজে গতানুগতিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে আজকাল কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।
গ। অফিসের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার কাজে আজকাল কম্পিউটার ব্যবপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ঘ। শিল্প ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের কাজেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।
ঙ। যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান, ঘরবাড়ি, ব্রিজ ইত্যাদি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে।
চ। বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজে।
ছ। একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে।
জ। শিক্ষাক্ষেত্রে।
ঝ। বিনোদনের ক্ষেত্রে যেমন- টিভি দেখা, ভিডিও দেখা ও গান বাজানো ইত্যাদি।
ঞ। মুদ্রণশিল্পে প্রকাশনামূলক যে কোন কাজে।
চ। যোগাযোগ ব্যবস্থায় টিকিট বিক্রি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সপোর্টের ডিরেকশন ও নির্ণয়ের কাজে।
ছ। আবহাওয়া পূর্বাভাস পর্যবেক্ষণের কাজে।

১২। ড্রাফটস্‌ম্যান শপে ব্যবহৃত কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম সমূহের বর্ননা ঃ

ক। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট (Microsoft Worf Document)ঃ এই প্রোগ্রামের সাহায্যে আমরা ছোট বড় যে কোন ধরনের লিখার কাজ করতে পারি । যেমন- বিভিন্ন ধরনের অফিসিয়াল চিঠি,বই, পত্রিকা, প্রশ্নপত্র ইত্যাদি টাইপ করে প্রিন্ট করা যায় ।

খ। মাইক্রোসফট পাবলিশার ডকুমেন্ট (Microsoft Publisher Document)ঃ এই প্রোগ্রামের সাহায্যে আমরা যে কোন ধরনের বোর্ড ও ব্যাকড্রপের লিখা মাপতুল সহকারে লিখে প্রিন্ট করে বোর্ড ও ব্যাকড্রপের কাজ অতি সহজে সম্পন্ন করতে পারি।

গ। মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (Microsoft Powerpoint Presentation)ঃ এই প্রোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন ক্লাস এবং অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও সুন্দর করে সাজিয়ে উপস্থাপনা করা যায় । এবং বিভিন্ন ভিজিটিং প্রেজেন্টেশন এর কাজে এই প্রোগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ও প্রতিটি স্লাইড বা বিষয় আলাদা আলাদা ভাবে উপস্থাপন করা যায়। এই প্রোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা যায় ।

ঘ। মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কশীট (Microsoft Excel Worksheet)ঃ এই প্রোগ্রামের সাহায্যে
আমরা যে কোন ধরনের আর্থিক লেনদেন এর হিসাব, যে কোন ধরনের শুমারীর হিসাব, পরীক্ষার রেজাল্টশীট তৈরী ইত্যাদি কাজ খুব সহজেই করতে পারি ।

গ্রাফিক্স ডিজাইন

১। **গ্রাফিক্স মূলত দুই প্রকারঃ** ক। রাস্টার গ্রাফিক্স খ। ভেক্টর গ্রাফিক্স

ক। রাস্টার গ্রাফিক্সঃ Adobe Photoshop,Gimp Krita,Corel Photopaint এবং Pixelmator কে প্রাথমিকভাবে রাস্টার গ্রাফিক্স সফটওয়্যার বলা হয়।

রাস্টার গ্রাফিক্স হলো আমরা সাধারণত বাস্তব জীবনে যেসব পিকচার গুলো দেখি সেগুলো ছোট ছোট বা অসংখ্য পিক্সেল দিয়ে তৈরি। সাধারনত এগুলো .jpeg, .png, .gif, .bmp ইত্যাদি ফরম্যাট এ থাকে। আমরা প্রায় খেয়াল করলে দেখি যখন একটা ফাইল অনেক জুম করা হয় বা বেশ বড় স্কিনে দেখানো বা প্রদর্শিত করা হয় তখন পিকচারটি ফেটে যায় এবং ফ্যাকাসে হয়ে যায় এর মূল কারনে রয়েছে রাস্টার বা পিক্সেল।

খ।ভেক্টর গ্রাফিক্সঃ Adobe Illustrator ,Inkscape Sketch,Affinity Designer এবং Corel draw কে প্রাথমিকভাবে রাস্টার গ্রাফিক্স সফটওয়্যার বলা হয়। ভেক্টর ইমেজ রাস্টার ইমেজ এর থেকে আলাদা। ভেক্টরের ভেতর ডট বা পিক্সেল এর কোন ব্যাপার নেই। এটা বিভিন্ন ধরনের ভেক্টর ভিত্তিক গানিতিক সমীকরন আর জ্যামিতিক ফরমুলা ধারা। যার জন্য এটা কত পিক্সেলের ছবি সেটা নিয়ে কোন চিন্তা নেই কারন কোয়ালিটি কখনো নষ্ট হবে না এবং ভেক্টর গ্রাফিক্স এর থেকে অনেক সহজ। সাধারনত এগুলো .ai, .eps, .svg ইত্যাদি ফরম্যাট এ থাকে।

২। **পিক্সেল কিঃ** পিক্সেল হলো একটা ছবির ক্ষুদ্রতম একক। পিক্সেল হলো বর্গাকার আকৃতির। অসংখ্য পিক্সেল মিলে একটা ছবি গঠিত হয়।

৩। **রেজুলেশন কিঃ** প্রতি ইঞ্চি পরিমান জায়গায় যে পরিমান পিক্সেল থাকবে সেটি হলো রেজুলেশন।

আমরা ২ ধরনের মাধ্যমে ডিজাইন গুলো আপলোড করি বা ব্যবহার করি যথাঃ–
ক। ইলেকট্রনিক মিডিয়া
খ। টেলিভিশন
গ। ওয়েব
ঘ। কম্পিউটার
ঙ। মোবাইল ইত্যাদি

৪। **প্রিন্ট/ প্রেস মিডিয়াঃ**
ক। ব্যানার
খ। পোস্টার
গ। ফ্লায়ার
ঘ। ব্রশিউর
ঙ। বিজনেস কার্ড
চ। বিল বোর্ড ইত্যাদি

৫। গ্রাফিক্সের বিভিন্ন ব্যবহারঃ

ক। লোগো ডিজাইন
খ। ব্যানার ডিজাইন
গ। গ্রিটিং কার্ড ডিজাইন
ঘ। বিজনেস কার্ড ডিজাইন
ঙ। ব্রশিউর ডিজাইন
চ। ক্যালেন্ডার ডিজাইন
ছ। বিজনেজ ফর্ম ডিজাইন
জ। ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন
ঝ। ক্যাটালগ ডিজাইন
ঞ। পোস্টার ডিজাইন
ট। লেটার হেড ডিজাইন
ঠ। বুক কভার ডিজাইন
ড । নিউজ পেপার ডিজাইন
ঢ। ই-বুক ডিজাইন
ণ। ফ্লাইয়ার ডিজাইন
ত। পোস্টকার্ড ডিজাইন

এছাড়া ইমেজ ক্রিয়েশন এবং ইমেজ ইডিটিং তো রয়েছেই.....

তাছাড়া রয়েছে আরো অনেক কিছু.....

৬। গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রঃ

ক। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি
খ। ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং হাউজ
গ। ইন্টার‍্যাক্টিভ মিডিয়া
ঘ। ব্র্যান্ড ডিজাইন
ঙ। লগো ডিজাইনার
চ। ব্রশিউর মার্কেটিং
ছ। ম্যাগজিন ডিজাইন
জ। কর্পোরেট রিপোর্টস
ঝ। সংবাদপত্র
ট। ইউআই/ইউএক্স ডিজাইন
এছাড়া বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক মার্কেটে ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ তো রয়েছেই.....

৭। কালার (Colour) কিঃ কোন বস্তু দ্বারা আলোর বিচ্ছুরণ বা তার মধ্য দিয়ে আলো প্রতিসরণ অথবা তা থেকে প্রতিফলিত আলো দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের চাক্ষুস অনুভূতিই হল কালার (Colour)।

৮। কালার হচ্ছে ২ ধরনের। যথাঃ

RGB Color //R=Red, G=Green, B= Blue

*CMYK Color // C=Cyan , M= Magenta, Y=Yellow, K=Key blackআমাদের ডিজাইনটি যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য করা হয় তাহলে সেটি RGB কালার মোডে হবে।

আর আমাদের ডিজাইনটি যদি প্রিন্ট করা হয় তাহলে সেটি CMYK কালার মোডে হবে।

৯। RGB কালারও CMYK কালারের পার্থক্যঃ

RGB কালার দামি কালার CMYK সস্তা কালার

RGB কালারের Brigtness বেশি CMYK কালারের Brigtness কম

RGB কালারের স্থায়িত্ব কম CMYK কালারের স্থায়িত্ব বেশি

ফটোশপ

১। সবার উপরে থাকে মেনুবার

২। তার নিচে থাকে অপশন বার/ টুলস এর কাজের উপর অপশন গুলো চেইঞ্জ হয়।

৩। বাম পাশে লম্বালম্বি ভাবে যে বার থাকে থাকে তাকে টুলস বার বলে।

৪। টুলস বার কে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক। ১ম পার্টটি হলো সিলেকশন বার

খ। ২য় পার্টটি হলো ইমেজ ইডিটিং বার

গ। ৩য় পার্টটি হলো অবজেক্ট ক্রিয়েশন বার

ঘ। ৪র্থ পার্টটি হলো ভিউ কালার এ্যাপ্লাই বার

৫। ফ্লোটিং প্যালেটঃ ডান পাশে লম্বালম্বি ভাবে যে বার থাকে তাকে ফ্লোটিং প্যালেট বলে।
ফ্লোটিং প্যালেটর সকল বিষয় মেনুবারের উইন্ডো মেনু থেকে পাওয়া যায়।
ফটোশপে সব অপশন এলোমেলো হয়ে গেলে আমরা উইন্ডো মেনু থেকে ঠিক করতে পারি অথবা ফটোশপটি কে রিসেট দিতে পারি তার জন্য আমাদের--- window/workspace- /reset essential এ যেতে হবে। তাহলে আবার ফটোশপ আগের মতো হয়ে যাবে।

অপশনবার টি সাধারনত এক লাইনে থাকবে এটি আমরা কাজের সুবিধার্থে এক লাইনে নিয়ে এসে কাজ করি। টুল বারটি এক লাইনে আনার জন্য আমাদের টুলবারের উপরে বামে এরো আছে ওখানে ক্লিক করলে দুই লাইনে আসে। আমরা যে ফটোশপে কাজ করবো তার জন্য আমাদের ও একটি ডুকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে।
৬। আমরা নতুন ডুকুমেন্ট আনার জন্য ঃ Ctrl+N // File --/New এ যেতে হবে তারপর কিছু অপশন আসবে।

File Name – Cartoon design

Presset: আমরা যে নিচের তথ্য গুলো দিবো সেগুলো যদি না বুঝি তাই এখানে থেকে যে কোন একটা সিলেক্ট করলে নিচের তথ্য গুলো অটো ফিলাপ হবে।আমরা যদি মাপ জানি তাহলে প্রিসেট অপশনটি অন করবো না।

Height: লম্বাই আপনার পেইজটা কতটুক হবে।

Width: প্রস্থ্য বা ২ পাশে আপনার পেইজটা কতটুক হবে।

Resulation: প্রতি ইঞ্চি পরিমান জায়গায় যে পরিমান পিক্সেল থাকবে সেটি হলো রেজুলেশন।

Resulation: এর সর্বনিম্ন ৭২ পিক্সেল আর সর্বোচ্চ ৩০০ পিক্সেল (৭২ বা ৩০০ পিক্সেল এর মধ্যে যে কোন রেজুলেশনে কাজ করা যায়) তবে আমাদের ও খেয়াল রাখতে হবে ডিজাইনটি যদি পোস্ট করা হয় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সেক্ষেত্রে ৭২ পিক্সেল আর যদি এই ডিজাইনটি প্রিন্ট করা হয় সেক্ষেত্রে ৩০০ পিক্সেল দিয়ে করতে হবে।

৭। পেইজের ইউনিটঃ

আমদের ডিজাইনটি যদি সোস্যাল বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আপলোড করার জন্য করা হয় সেক্ষত্রে ইউনিট টি হবে পিক্সেল ।

আমদের ডিজাইনটি যদি প্রিন্ট মিডিয়ায় জন্য করা হয় সেক্ষত্রে ইউনিট টি হবে ইঞ্চি।

আমাদের মূলত এই দুই ধরনের ইউনিট বেশি ব্যবহার হয়।

৭২ পয়েন্টস = ১ ইঞ্চি

১ ইঞ্চি = ৬ পিকাস

কালার মোড

৮। আমরা ফটোশপে ৫ ধরনের কালার দেখতে পাইঃ

ক। বিটমেপ কালার ১০০ ব্ল্যাক অথবা ১০০ হোয়াইট।

খ। গ্রেস্কেল ১০০ ব্ল্যাক এবং ১০০ হোয়াইট।

গ। আরজিবি কালার।

ঘ। সি এম ওয়াই কে।

ঙ। ল্যাব কালা হলো আরজিবি কালার কে প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

আমরা সাধারনত আরজিবি এবং সিএমওয়াইকে কালার ব্যবহার করি।

ডান পাশে থাকে বিট, বিট হচ্ছে কালার দেওয়ার ক্ষমতা।

৮ বিট ১৬.৬৭ মিলিয়ন কালার দেয়।

১৬ বিট এটি প্রায় ৩৩ কোটি কালার দেয়।

৩২ বিট ৬৩ কোটি কালার দেয়।

আমরা সাধারনত ৮ বিট বা ১৬ বিট নিয়ে কাজ করবো।

ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সবসময় হোয়াইট থাকবে।

আমাদের নিচে আরো অপশন আছে এগুলো ফটোশপ এর নিজস্ব সাইজ আমরা এখানে কিছু করবো না।

সব শেষ হলে ওকে দিয়ে দিবো তারপর একটি নতুন ডকুমেন্ট তৈরী হবে।

ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে ডানপাশে ফ্লোটিং প্যালেটে লেয়ার অপশনটি চালু হবে।

আমরা ফটোশপে যা কাজ করবো সব লেয়ারের ভিতরে করতে হবে।আমাদের প্রত্যেকটি ইলিমেন্ট কে ইডিট ও নড়াচাড়া করার জন্য নতুন নতুন লেয়ার নিয়ে কাজ করতে হবে।

নতুন লেয়ার নেওয়ার জন্য নিচে ডিলেট বাটন এর পাশেই প্লাস আইকন এর মতো আছে ওখানে ক্লিক করলেই নতুন লেয়ার হবে। অথবা shift+ctrl+n চাপলেও হবে।

৯। আমরা ফটোশপে ২ ভাবে কালার নিতে পারিঃ

উপরের কালার টি হলো Forground Color এটি এ্যাপ্লাই করার জন্য alt+delet/alt+backspace

নিচের কালার টি হলো Background Color এটি এ্যাপ্লাই করার জন্য ctrl+delet/ctrl+backspace

অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর

১। ইলাস্ট্রেটরঃ (Illustrator)

ইলাস্ট্রেটর হল একটি গ্রাফিক্স ডিজাইন সফটওয়্যার। এডোবি ইলাস্ট্রেটর এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা যায়। Adobe corporation এর বাজারজাতকৃত একটি সফটওয়্যার।

২। অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের প্রধান কাজঃ

ইলাস্ট্রেশন মানে দৃশ্যমান ছবি। ইলাস্ট্রেটর মানে যে ছবি আঁকে। এডবি ইলাস্ট্রেটর ছবি আঁকা আঁকির একটি সফটওয়্যার।উচ্চ রেজুলেশনে ছবি আঁকাআঁকি, সম্পাদনা, বড় বড় ব্যানার বা দৃষ্টিনন্দন বিজনেস কার্ড ডিজাইন এর মত প্রফেশনাল সব ইলাস্ট্রেশন এর কাজ এই সফটওয়্যার টি দিয়ে করা হয়। বাজারে এর প্রতিদ্বন্দ্বী আরো সফটওয়্যার থাকলেও ইলাস্ট্রেশন এর কাজে এডবি ইলাস্ট্রেটরকে প্রফেশনালগন আদর্শ সফটওয়্যার হিসেবে ব্যবহার করেন।

৩। আর্টবোর্ডঃ ফটোশপে আমরা যেটিকে ডকুমেন্ট বলতাম ইলাস্ট্রেটরে সেটিকে বলে আর্টবোর্ড।

ক। সবার উপরে থাকে মেনুবার

খ। তার নিচে থাকে অপশন বার/ টুলস এর কাজের উপর অপশন গুলো চেইঞ্জ হয়।

গ। বাম পাশে লম্বালম্বি ভাবে যে বার থাকে তাকে টুলস বার বলে

ঘ। ডান পাশে যে বার থাকে তাকে ফ্লোটিং প্যালেট বলে।

৪। নতুন ডকুমেন্ট তৈরিঃ নতুন ডকুমেন্ট নেওয়ার জন্য --- Ctrl+N // File --/New এ যেতে হবে তারপর কিছু অপশন আসবে। যেমনঃ

a. File Name – Cartoon design

b. Profile- এই ডিজাইনটি কি জন্য বানানো হচ্ছে।

c. Number Of Artboard -5 আমরা ইলাস্ট্রেটরে সর্ব্বোচ ৯৯৯ টি আর্টবোর্ড নিতে পারবো। একটা আর্টবোড নিলে নিচের কিছু অপশন আসবে না, ২ বা তার অধিক আর্টবোর্ড নিলে অপশন গুলো আসবে।

d. Spaching হলো দুইটা আর্টবোর্ড এর মাঝের দূরূত্ব Coloumn- 2

e. Size – নিজেদের মতো।

f. Height- লম্বাই আপনার আর্টবোর্ড কতটুক হবে।

g. Width- প্রস্থ্য বা ২ পাশে আপনার আর্টবোর্ড কতটুক হবে।

h. Unite – Pixel/Inchi।

i. Oriantation- landscape/potraite।

j. Bleed – আমরা শুরুতেই ব্লেড এরিয়া দিতে পারি।

k. Colour Mode- RGB/CMYK।

l. Resulation -72/300\

m. Ok– দিলেই আর্টবোর্ড ওপেন হয়ে যাবে।

বাকি সব ফটোসপের মতো।

৪। টুলস বার কে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক। ১ম পার্টটি হলো সিলেকশন পার্ট
খ। ২য় পার্টটিহলো অবজেক্ট ক্রিয়েশন পার্ট
গ। ৩য় পার্টটি হলো অবজেক্ট ইডিটিং পার্ট
ঘ। ৪র্থ পার্টটি হলো কালার এ্যাপ্লাই এবং ইডিটিং পার্ট
ঙ। ৫ম পার্টটি হলো সিম্বল এবং চার্ট পার্ট
চ। ৬ষ্ঠ পার্টটি হলো ভিউ পার্ট
আমরা যদি আর্টবোর্ড বাড়াতে বা আর্টবোর্ড এর দূরুত্ব বাড়াতে কমাতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের আর্টবোর্ড টুলের সাহায্যে বাড়াতে কমাতে হবে।
আর্টবোর্ড ডিলেট করতে হলে আর্টবোর্ড টুল এর মাধ্যমে সিলেক্ট করে ডিলেট চাপলেই ডিলেট হয়ে যাবে।
আর্টবোর্ড টুলের সাইজে আর্টবোর্ডে ও সাইজ ছোট বড় করা যায়।
যদি টুলবার এ টুলস কম থাকে সেক্ষেত্রে Window-/-tolls-/-advanced – দিলে টুলস এর সংখ্যা বারবে।
ফ্লোটিং প্যালেটে কোন অপশন না পেলে সেটি Window Menu – থেকে পাবো ।
আর আমাদের ইলাস্ট্রেটর এর সব অপশন উল্টা পাল্টা হয়ে গেলে আমরা রিসেট করে নিবো। যার জন্য আমাদের window menu-/-workspace-/-reset essential – এ যেতে হবে।তাহলে ইলাস্ট্রেটর টা আগের অবস্থানে ফিরে আসবে।
আমরা আর্টবোডের্র বাহিরে ও কাজ করতে পারবো ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার এর সাহায্যে।
আমাদের আর্টবোর্ড থেকে ওয়ার্কিং এরিয়াটা ৬ হাজার ৪০০ গুন বড়।
ওয়ার্কিং এরিয়ার বাহিরে কোন কাজ করা যাবেনা।
ওয়ার্কিং এরিয়ার কালার চেইঞ্জ করতে হলে Edit-preference-user interface – আমরা এখানে থেকে পরিবর্তন করতে পারবো।
আমরা ২ ধরনের কালার দেখতে পাই, একইরকম ফটোশপের মতো কিন্তু এখানে এটা ভিন্ন।
প্রথম কালারটি হলো ফিল কালার আর নিচের টি হলো স্টোক কালার।
ভিতরের কালারটি হলো ফিল কালার আর বাহিরের দাগ টি হলো স্টোক কালার
আমাদের ফটোশপের মতো ইলাস্ট্রেটরে লেয়ারের কোন ঝামেলা নেই।এখানে অটো লেয়ার ক্রিয়েট হয়।

৫। <u>এডোবি ইলাস্ট্রেটর টুলস পরিচিতিঃ</u>

এডোবি ইলাস্টেটর ওপেন করার পর বাম পাশে যে টুলবক্স দেখা যায়। যদি কোনো কারণে টুলবার দেখা না যায় তাহলে উপরে Window লেখাতে ক্লিক করলে Tools লেখা অপশন সিলেক্ট করলে চলে আসবে।

a. <u>Selection Tool:</u> সিলেকশন টুল দিয়ে যেকোনো ধরনের অবজেক্ট সিলেক্ট করা বা নাড়াচাড়া করা যায়।

b. <u>Direct Selection Tool:</u> যেকোনো shape বা object সিলেক্ট করা যায় এই টুলের মাধ্যমে। মানে আপনি চাইলে যে কোন এ্যাংকর পয়েন্ট এডিট করতে পারেন এই টুল এর সাহায্য।
গ্রুপ সিলেকশন টুল দিয়েও একসাথে একাধিক anchor point সিলেক্ট করে পরিবর্তন করা যায়।

c. <u>Wand Tool:</u> এই টুলের সাহায্যে ইলাস্ট্রেটর একই ধরনের কালার সিলেক্ট করা যায়।

d. <u>Pen tool:</u> দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পাথ তৈরি করা যায়। এই টুলসটির অনেক সুবিধা রয়েছে তবে অনেকটা এডোবি ফটোশপের মত।

e. <u>Type tool:</u> এর সাহায্যে সব ধরনের টাইপ করা হয়। মানে এডোবি ইলাস্ট্রেটর ডিজাইন করার জন্য যত ধরনের লেখা পাওয়া যায় সবই এই টুলের আন্ডারে করা হয়।তবে লেখাগুলোকে গুছিয়ে বা আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এর আরো কিছু subtool রয়েছে। আকর্ষণীয় subtool সমূহ নিম্নরূপঃ

1. Vertical Type Tool: এর সাহায্যে আপনি লম্বালম্বি ভাবে টেক্সট লিখতে পারবেন।

2. Vertical Area Type Tool: এর সাহায্যে বক্সের মধ্যে লেখা যায়।

3. Vertical Type On Path Tool: এটি দিয়ে পাথ এর মধ্যে টাইপ করা যায়।

4. Touch type Tool: এর সাহায্যে যেকোনো টেক্সট এর উপর ক্লিক করে টেক্সড মডিফাই করতে পারেন।

<u>f. Line Segment Toolt</u>: এই টুলের সাহায্যে ইলাস্ট্রেটরের লাইন তৈরি করা যায়। এর কিছু Sub tool রয়েছে। যেমন ঃ

1. Arc Tool: এর সাহায্যে বিভিন্ন এরিয়ায় Arc তৈরি করতে পারবেন।

2. Spiral Tool: এর সাহায্যে সমানভাবে প্যাঁচ তৈরি করতে পারবেন।

3. rectangular Gird Tool: এর সাহায্যে আপনি নরমালি টেবিল তৈরি করতে পারবেন।

4. Polar Grid Tool: এটি দিয়ে গোল আকৃতির মত স্ট্রোক তৈরি করা যায়।

g. <u>Rechtangle tool</u>: এর সাহায্যে চতুর্ভুজ তৈরি করতে পারবেন। এর sub টুলসমূহ নিম্নরুপঃ

1. Rounded Rectangle tool: এটি ব্যবহার করে গোলাকার কোনো বিশিষ্ট চতুর্ভুজ তৈরি করতে পারবেন।

2. Ellipse tool : এটির সাহায্যে বৃত্ত তৈরি করতে পারবেন।

3. Polygon tool: এটি দিয়ে বহুভুজ আকৃতির কিছু তৈরি করা যায়।

4. Start tool: এটি দিয়ে স্টার আকৃতির যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারবেন।

5. Flare Tool: এটি ব্যবহার করে ফিল্ডভাবে Flare তৈরি করা যায়।

6. Paintbrush tool: ব্যবহার করে প্যান্ডেলের মতো পাথ তৈরি করা যায়।

h. <u>Blob brush tool</u>: ব্যবহার করে smoothly স্টক তৈরি করা যায়। এই টুল দিয়ে drawing করা যায়। এর subtool সমূহঃ

1.Pencil tool: এই টুলের মূল কাজ হল ড্র করা।

2. smooth tool: এর সাহায্যে পেন্সিল টুলের পয়েন্ট কে স্মুথ করে নেওয়া যায়। এক কথায় পয়েন্ট টি আপনি ঠিকঠাকভাবে সাজাতে পারবেন।

3. path eraser tool: এটি দিয়ে আপনি কোন কিছু ইরেজার করতে পারবেন। মানে যে কোন অংশ মুছে ফেলতে পারবেন।

4. Join tool: এটি ব্যবহার করে path eraser কে জোড়া লাগানো যায়।

5. Eraser Tool: এর সাহায্যে কোন ইমেজ বা লেয়ার কিংবা যে কোন অংশ সিলেক্ট করে মুছে ফেলতে পারবেন।

6. Scissors tool: দিয়ে path এর পয়েন্ট গুলো কাটা যায়।

7. Knife tool: দিয়ে যে কোন এরিয়া সিলেক্ট করে কাটা যায়।

8. Rotate tool: এইতো ডকুমেন্টকে রোটেট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। Reflect tool দিয়ে পয়েন্ট ধরে যে কোন ডকুমেন্টকে Reflect করতে পারবেন।

9. scale tool: দিয়ে অবজেক্টকে ছোট বড় করতে পারবেন। Shear Tool ব্যবহার করে ছবি রুটেড ও কপি করা যায়। Reshape tool ব্যবহার করে রুটেড করতে পারবেন।

10. Width tool: এটি দিয়ে স্টকে মডিফাই করা যায়।

11. warp tool: এই টুল দিয়ে অবজেক্ট এরিয়া মডিফাই করা যায়।

12. Twirl tool: এই টুল ব্যবহার করে অবজেক্টের উপর সার্কেল তৈরি করতে পারবেন।

12. Pucker tool Bloat tool: এটি দিয়ে অবজেক্টের এরিয়া ধরে ধরে কাজ করা যায়।

13. Scallop tool: এই টুল দিয়ে অবজেক্ট ইফেক্ট এড করা যায়।

14. Crystallize tool: এই ফুল অবজেক্টে ইফেক্ট এড করে।

15. Wrinklw Tool: এটি ব্যবহার করে ডেউ আকৃতির কোন কিছু তৈরি করা যায়।

16. puppet Warp Tool: এই টুল ব্যবহার করে বাঁকা সাইজের ইমেজ তৈরি করা যায়।

17. Free Transform tool: এই টুল দিয়ে অবজেক্টকে চারদিকে ঘুরানো ও পরিবর্তন করা যায়।

18. Shape Builder tool: এই টুল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অংশকে ক্রপ করা যায়।

19. Live Paint Bucket Tool: এটি ব্যবহার করে পেইন্ট করা যায়।

20. Live Paint Selection tool: এই টুল দিয়ে সিলেকশন করে পেইন্ট করা যায়।

21. Symbol style Tool: নতুন স্টাইল দেওয়া যায়।

22. Column Graph tool: ইনফরমেশন গ্রাফিক্সের কাজে চলছে খুব প্রয়োজনীয় একটি টুল। এটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিজনেস চার্ট আর্ট গ্রাফ ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

23. Column Graph tool: এই টুল দিয়ে ডকুমেন্টে এরিয়া সিলেক্ট করে চার্ট তৈরি করতে পারবেন।

24. Stacked Column Graph tool: এই টুলের ক্ষেত্রে সেম চার্ট বের হবে।

25. Bar Graph tool: এই টুলের সাহায্যে গ্রাফের মত লাইন তৈরি করা যায়।

26. Stacked Bar Graph tool: এটার কাজ মোটামুটি।

27. Area Graph Tool: এই টুল দিয়ে এরিয়া চার্ট তৈরি করতে পারবেন।

28. Scatter Graph tool: এই টুল দিয়ে ও এরিয়া চার্ট তৈরি করতে পারবেন।

29. Pic Graph tool: এই টুল দিয়ে আর্ট জাতীয় গ্রাফ তৈরি করা যায়।

30. Redar Graph Tool: এই টুল ব্যবহার করে গোলাকৃতির মত চার্ট তৈরি করা যায়।

31. Slice tool: এই টুল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কোন এরিয়াকে কাটতে পারবেন। Slice Selection tool: এই টুল দিয়ে এরিয়া সিলেকশন করে ডকুমেন্ট কে গ্রুপ করতে পারবেন।

31. Artboard Tool: এই টুল দিয়ে যে কোন ডকুমেন্ট কে সিলেক্ট করে আর্ট এ পরিবর্তন করতে পারবেন। নতুন আর্টবোর্ড তৈরি করতে পারবেন।

32. Hand tool: এটি দিয়ে কোন ডকুমেন্ট কে সরানো বা নাড়াচাড়া করা যায়।

33. Print Tilling Tool: এটি ব্যবহার করে প্রিন্টের জন্য সাইজ নির্ধারণ করতে পারবেন।

34. Zoom tool: এটি দিয়ে যেকোনো ডকুমেন্টকে জুম ইন এবং আউট করতে পারবেন।

35. Stroke : এটি দিয়ে ডকুমেন্টে স্ট্রোক কালার দিতে পারবেন।

36. Gradient ,Color None Color: যেকোনো ডকুমেন্টে কালার, গ্রেডিয়েন্ট কালার সিলেক্ট করা যায়। এবং চাইলে সেখান থেকে none কালার দেওয়া যায়।

37. Draw Arrow: এই টুল ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো adboard size ছোট বড় করা যায়।

৬। **উপসংহারঃ**

বর্তমানে এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকি এর জন্য বর্তমান যুগকে কম্পিউটারের যুগ বলা হয়। তাই কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বাংলা অক্ষর লিখন পদ্ধতি (ব্লক, ফ্ল্যাট, ন্যারো)

১। **বাংলা লেখাঃ** বাংলা অক্ষর বা লেখাগুলোকে নির্দিষ্ট মাপনীতে নিয়ম অনুযায়ী সুন্দর ভাবে ডাবল লাইনে বা ছাপার অক্ষরের ন্যায় লেখার পদ্ধতিকে বাংলা লেখা বলে।

২। **বাংলা লেখার প্রকারঃ** টাইপ বা ধরণ অনুযায়ী বাংলা লেখা-৩ প্রকার। যথাঃ

ক। **ব্লক টাইপঃ** বাংলা যে সমস্ত লেখার উচ্চতা এবং চওড়া প্রায় সমান থাকে তাকে ব্লক টাইপ লেখা বলে।
খ। **ফ্ল্যাট টাইপঃ** বাংলা যে সমস্ত লেখার উচ্চতা কম চওড়া বেশী থাকে তাকে ফ্ল্যাট টাইপ লেখা বলে।
গ। **ন্যারো টাইপঃ** বাংলা যে সমস্ত লেখার উচ্চতা বেশী চওড়া কম থাকে তাকে ন্যারো টাইপ লেখা বলে।

৩। **বাংলা লেখার নিয়ম বা পদ্ধতিঃ** বাংলা ডাবল লাইনে লিখতে হলে প্রথমে কাগজে বা যে স্থানে লিখতে হবে সেখানে লিখার সাইজ বা ধরন অনুযায়ী কাগজের ডানে বামে ৪টি সমান্তরাল লাইন টানতে হবে। ৪টি লাইনের মধ্যে ৩টি ঘর উৎপন্ন হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের মাঝের উৎপন্ন ঘরকে মাত্রা ঘর বলে। ২য় ও ৩য় লাইনের মাঝের উৎপন্ন ঘরকে অক্ষর ঘর বলে। ৩য় ও ৪র্থ লাইনের মাঝের উৎপন্ন ঘরকে কৌণিক ঘর বলে। মাত্রা ঘরের মোটা এর সমান হবে অক্ষরের বাহুর মোটা। অক্ষরের শেষ অংশ গুলো কিছুটা চিকন হয়ে শেষ হবে। প্রত্যেকটি অক্ষরকে ডাবল লাইনে লিখতে হবে পেন্সিলের সাহায্যে। যাহা পরবর্তীতে কালি অথবা রংয়ের দ্বারা ভরাট করে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যায়।

৪। **বাংলা লেখার প্রয়োজনীয়তাঃ** বর্তমান যুগে বাংলা লেখার গুরুত্ব খুবই। আমাদের দেশে প্রত্যেকটি অফিস আদালতে বাংলা লেখার প্রচলন বাধ্যতামূলক। তাই এরই মাঝে আবার বিভিন্ন সাইজে বড় করে লেখার প্রয়োজন অত্যাধিক। যেমন কোন অফিসের নাম বড় করে লিখতে হবে, সেখানে বাংলা ব্লককরে লিখতে হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংলা লেখার শুরুত্ব অপরিসীম। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এ দৃশ্য নির্ভুল হইলেও লিখিত অক্ষরগুলো যদি সুন্দরও বিধি সম্মত না হয় তা হলে ঐ ড্রইং এর উৎকৃষ্টতা অনেকাংশ কমে যায়। এই কারণে দৃশ্য অংকনের ন্যায় অক্ষর লিখনের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। প্রত্যোকটি অক্ষর যথা সম্ভব ছাপার ন্যায় সুস্পষ্ট এবং একই রকম হওয়া উচিত। তাই বাংলা লেখা সুন্দর ভাবে লিখে ড্রইং বা কোন স্থানে লেখার উৎকর্ষ বাড়ানো সময়ের দাবী।

৫। **ব্লক টাইপঃ** যে লেখার উচ্চতা ও চওড়া প্রায় সমান তাকে ব্লক টাইপ লেখা বলে।

বাংলা অক্ষর ব্লক টাইপ লিখা (স্বরবর্ণ)

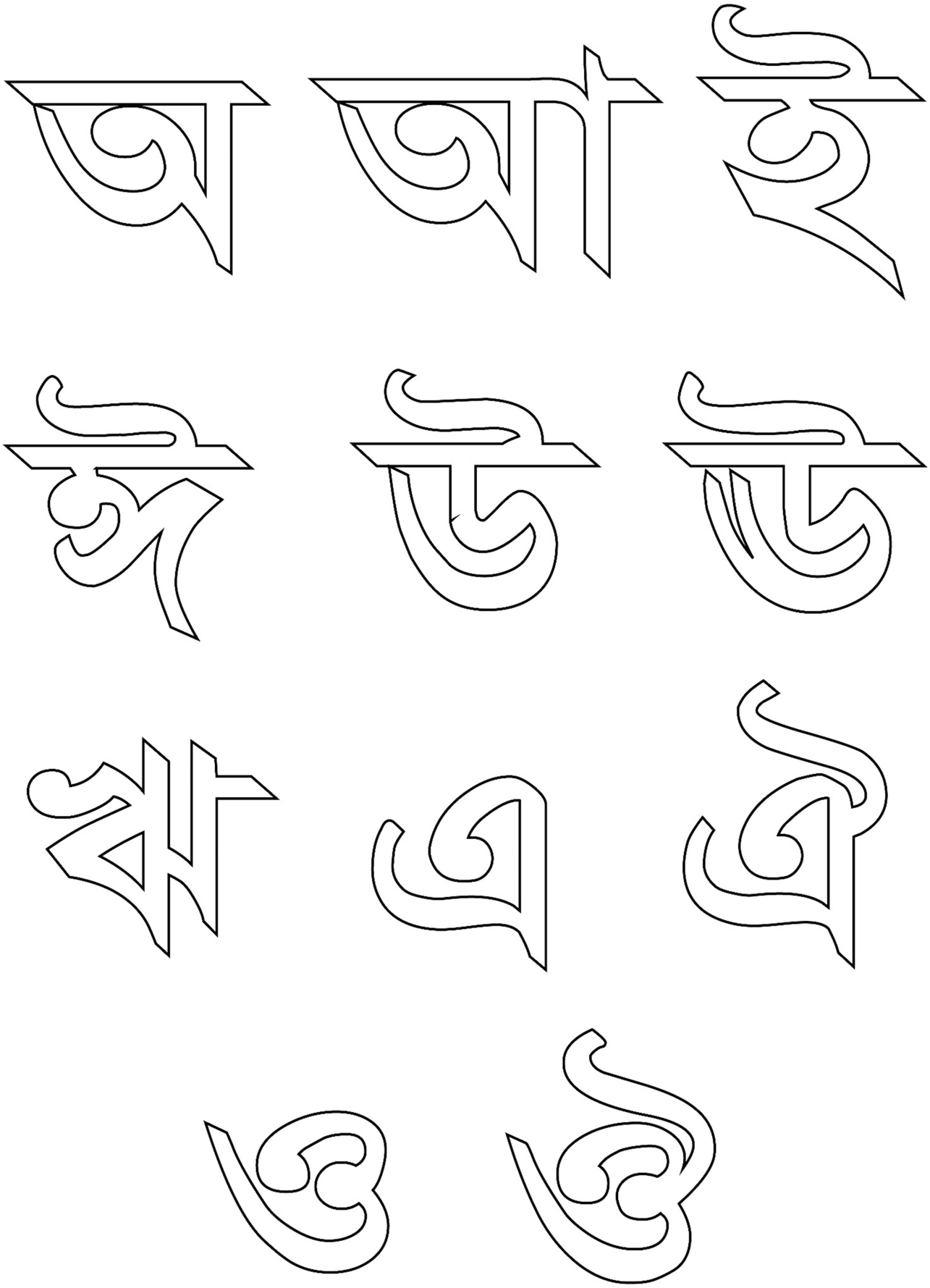

বাংলা অক্ষর ব্লক টাইপ লিখা (ব্যঞ্জনবর্ণ)

প ফ ব ভ

ম য র ল

শ ষ স হ

ড় ঢ় য় ৎ

ং ঃ ঁ

৬। **<u>ফ্ল্যাট টাইপঃ</u>** যে লেখার উচ্চতা কম ও চওড়া বেশী অর্থাৎ খাড়া হতে প্রস্থে বেশী তাকে ফ্ল্যাট টাইপ লেখা বলে।

৭। **<u>ফ্ল্যাট টাইপ লেখার নিয়মঃ</u>** বিভিন্ন লেখার মত বাংলা ফ্ল্যাট লিখার নিয়ম রয়েছে যেমন প্রথমে আমরা লেখার সাইজ অনুপাতে একটি সারি লেখার জন্য চারটি দাগ বা রেখা টেনে থাকি। প্রথম ও দ্বিতীয় রেখার বা লাইনের মাঝে যে ঘর উৎপন্ন হয় তাকে মাত্রা ঘর বলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনের মাঝে যে ঘর উৎপন্ন হয় তাকে অক্ষর ঘর বলে। তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের মাঝে যে ঘর উৎপন্ন হয় তাকে কৌণিক ঘর বলে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৌণিক ঘর মাত্রা দ্বিগুণ হবে। অক্ষর ঘর প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হবে।

৮। **<u>ফ্ল্যাট টাইপ লেখার প্রয়োজনীয়তাঃ</u>** পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশে বাংলা ভাষার প্রচলন থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ দেশ স্বাধীন হওয়ার সংঙ্গে সংঙ্গেই বাংলা লেখা পড়া এবং অফিস আদালতে এর প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে এই কম্পিউটার যুগেও সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে কোন বড় লেখা, দেওয়াল লিখন, ব্যানার লিখন, সাইন বোর্ড লিখন ইত্যাদি বড় লেখার কাজগুলি কম্পিউটারে লেখা সম্ভব হয় না। বাংলা ব্লক লেখার পাশাপাশি ফ্ল্যাট লেখার প্রয়োজন প্রচুর কিন্তু সে অনুপাতে লেখার অক্ষর কম। তাই যে জায়গাকে ভরাট ও সৌন্দর্য মন্ডিত করে তুলতে প্রস্থে অক্ষরের সাইজ বড় ও উচ্চতায় কম করে খালি জায়গাগুলি দখল করে নিতে হয়। ডানে বামে জায়গা বেশী অথচ লেখা বা অক্ষর কম সেখানে ব্লক টাইপ লেখা লিখলে লেখার প্রকৃত সৌন্দর্য ও উৎকষ্টতা থাকে না। বিধায় একজন ড্রাফটসম্যানকে ফ্লাট টাইপ লেখার পদ্ধতি যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা অক্ষর ফ্ল্যাট টাইপ লিখা (স্বরবর্ণ)

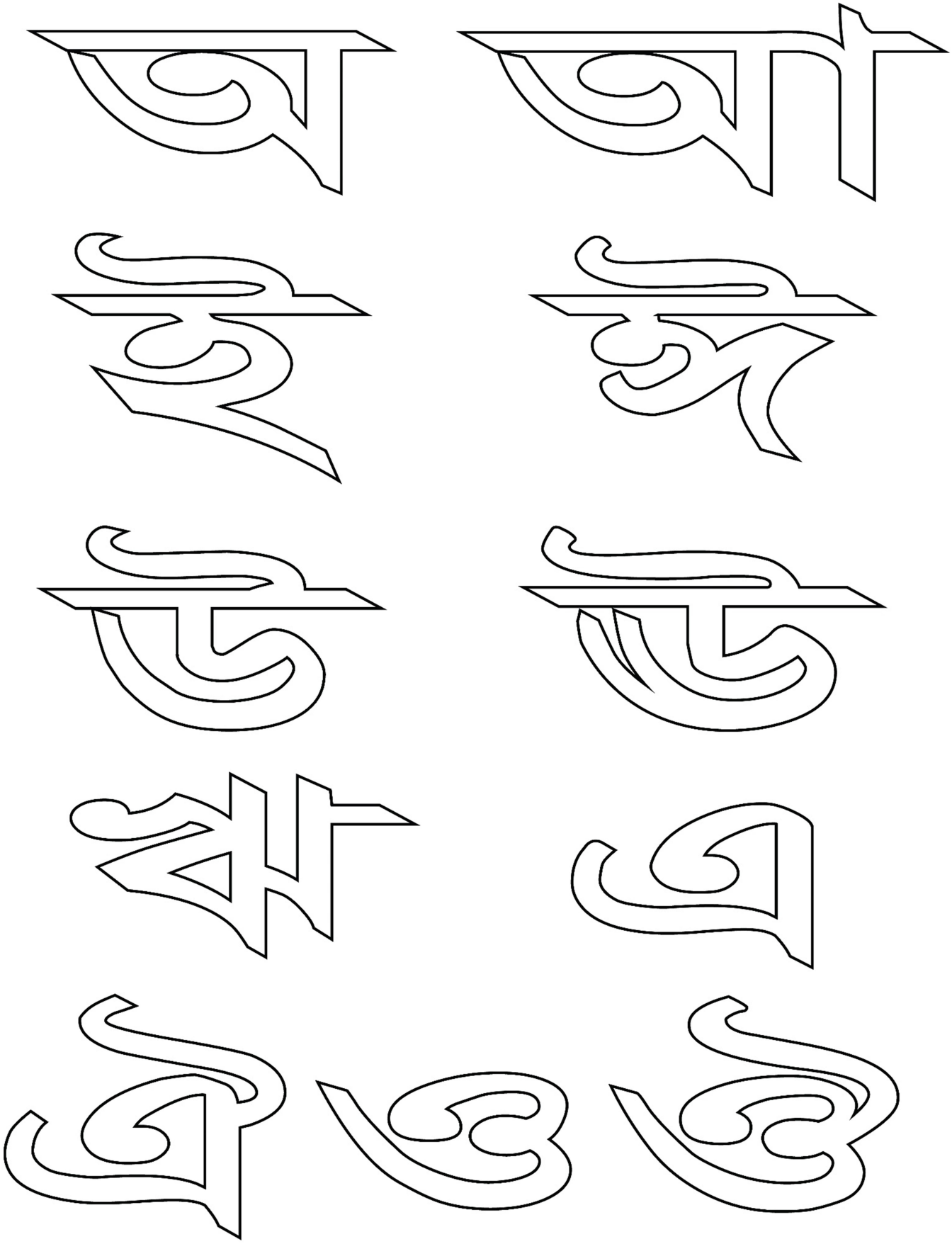

৯। **<u>ন্যারো টাইপ লেখার সংজ্ঞা।</u>** যে সব লেখার উচ্চতা বেশী কিন্তু চওড়া কম তাকে ন্যারো টাইপ লেখা বলে।

১০। **<u>ন্যারো টাইপ লেখার কারণঃ</u>** ন্যারো টাইপ লেখাগুলো সাধারণত যে সব স্থানের, উচ্চতা বেশী কিন্তু চওড়ায় কম যেমন, একটি বোর্ডের উচ্চতায় তিন ফুট, চওড়ায় দুই ফুট কিন্তু লিখতে হবে বড় অক্ষরে বাংলাদেশ লেখাটি উচ্চতায় বেশী দিয়ে প্রস্থে কম দিয়ে অক্ষরগুলি লিখতে হবে। যাতে পূর্ণ লেখাগুলো উক্ত বোর্ডে লিখে সম্পন্ন করা যায়। উক্ত স্থানে লেখাগুলো স্বভাবিকের চেয়ে উচ্চতা বেশী এবং প্রস্থে কম দেখা যাবে। সুতরাং ন্যারো টাইপ লেখার একমাত্র কারনই হলো যেখানে লেখার চেয়ে জায়গা কম অথচ লেখা উক্ত জায়গায় লিখতে হবে সে অবস্থায় ন্যারো টাইপ লেখা লিখতে হবে।

১১। **<u>ন্যারো টাইপ লেখার নিয়মঃ</u>** বিভিন্ন লেখার মত বাংলা ন্যারো টাইপ লেখারও একটি নিয়ম রয়েছে। যেমন প্রথমে লেখার সাইজ অনুপাতে চারটি লাইন টানতে হবে। চারটি লাইনের মধ্যে তিনটি ঘর উৎপন্ন করে। ১ম ঘরটি হবে মাত্রা ঘর ২য় টি হবে অক্ষর ঘর এবং ৩য় টি হবে কৌনিক ঘর। মনে রাখতে হবে যে মাত্রা ঘর যতখানি মোটা হবে কৌনিক ঘর তার দ্বিগুন মোটা অবশ্যই হতে হবে। তবে অক্ষর ঘরটি এমনভাবে হবে যে যতখানি অক্ষর লিখতে হবে সে পরিমানে রাখতে হবে। মাত্রা ঘরের মোটা অনুযায়ী অক্ষরের মোটা হওয়া বাঞ্চনীয়, অক্ষর ঘরটি এমনভাবে হবে যে, যতখানি অক্ষর লিখতে হবে সে পরিমানে রাখতে হবে। মাত্রা ঘরের মোটা অনুযায়ী অক্ষরের মোটা হওয়া বাঞ্চনীয়। তবে অক্ষরের শেষ অংশ এবং কৌণিক অংশগুলো তুলনামুলক সুরু ও চিকন হলে অক্ষরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

বাংলা অক্ষর ন্যাড়ো টাইপ লিখা (স্বরবর্ণ)

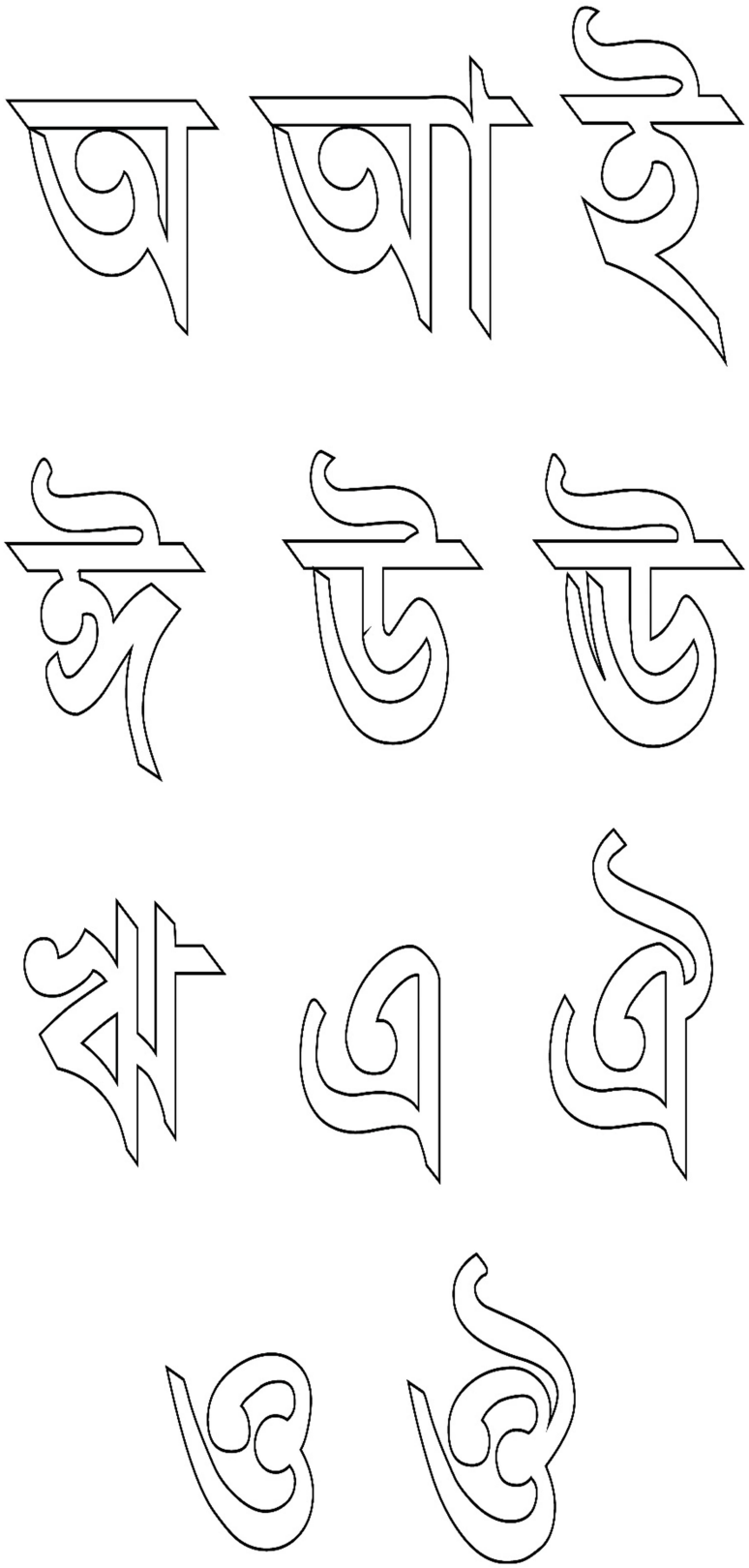

১২। উপসংহারঃ আমরা একজন ড্রাফটসম্যান ট্রেডের দক্ষ সদস্য বিধায়, বাংলা লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা কার্যক্ষেত্রে নানা ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় এবং যা আমাদের মোকাবেলা করতঃ লেখনি দক্ষতা আবশ্যক।

ইংরেজি অক্ষর লিখন পদ্ধতি (ব্লক, ফ্ল্যাট, ন্যারো)

১। **ভূমিকাঃ** আমরা আমাদের কারিগরী পেশা ড্রাফটসম্যান সমান হিসেবে নিজ নিজ ইউনিটে ইন্টেলিজেন্টস সেকশন কর্মরত থাকি। তাই মডেল সম্মন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে। যাতে পরবর্তীতে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করিতে পারি। যে কোন স্থানে ম্যাপ, মডেল আমাদেরকে ভূমির সাথে পরিচয় করে দেয়। ইহা তৈরী করতে বেশী টাকা ও অনেক সময় খরচ হয়। ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিকেরা ইহা সঠিকভাবে তৈরী করতে পারে। সেনাবাহিনীতে আমরা এমন অনেক কাজ করে থাকি। যাহা একই সময়ে অনেকগুলি করা লাগে এবং সেগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। তাহার জন্য এক এক সময় এক এক এলাকা কার্য সম্পাদনের জন্য এই সকল মডেল কাপড়ের উপর বিভিন্ন ভাবে তৈরি করিয়া থাকি সুতরাং এই মডেল তৈরি করার জন্য পেশাগত সকল সৈনিকদের একান্ত প্রয়োজন।

২। **ইংরেজী লেখার প্রয়োজনীয়তাঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ইংরেজী লেখায় গুরুত্ব অপরিসীম। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এর বেলায় দৃশ্য নির্ভূল হলেও লেখাগুলো যদি সুন্দর ও বিধি সম্মত না হয় তাহলে ঐ ড্রইং এর উৎকৃষ্টতা অনেকাংশ কমে যায়। এই কারণে দৃশ্য অংকনের ন্যায় অক্ষর লিখনের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি অক্ষর যথাসম্ভব চাপার অক্ষরের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং একই রকম হওয়া বাঞ্চনীয়। তাই ইংরেজী লেখা সুন্দর ভাবে লিখে ড্রইং বা কোন স্থানের লেখার সৌন্দর্য বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩। **ইংরেজী লেখার সংজ্ঞাঃ** ইংরেজী অক্ষর বা লেখাগুলোকে নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাপনীতে লেখার পদ্ধতিকে ইংরেজী লেখা বলে।

৪। **ইংরেজী লেখার প্রকারঃ** টাইপ বা ধরন অনুযায়ী ইংরেজী লেখা ০৩ প্রকার। যথাঃ

ক। ইংরেজী ব্লক টাইপ।
খ। ইংরেজী ফ্লাট টাইপ।
গ। ইংরেজী ন্যারো টাইপ।

৫। **ইংরেজী ব্লক টাইপ লেখার সংজ্ঞাঃ** ইংরেজী যে সমস্ত অক্ষর বা লেখাগুলোর উচ্চতা এবং প্রস্থে সমান তাকে ব্লক টাইপ লেখা বলে।

৬। **ইংরেজী ব্লক টাইপ লেখার পদ্ধতিঃ** ইংরেজী ব্লক টাইপ লেখা লিখতে হলে কাগজের বা যে স্থানে লিখতে হবে সে স্থানের উচ্চতা এবং প্রস্থ মেপে নিয়ে সে অনুযায়ী এবং পরিমান অনুযায়ী হিসাব করে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরী করে নিতে হবে। এবার বর্গক্ষেত্রটিকে সমান ভাবে উচ্চতা এবং প্রস্থের দিকে লাইন টেনে ছোট ছোট বর্গ তৈরি করে নিতে হবে। ইংরেজী ব্লক অক্ষরের বেলায় উচ্চতায় ৫ ঘর এবং প্রস্থে ৪ ঘর অর্থাৎ ৫×৪ ঘরে লিখতে হবে। তবে কিছু কিছু অক্ষর যেমনঃ A, M, T, V, W, Y এই অক্ষরগুলো ৫×৫ ঘরে লিখতে হবে। I অক্ষরটি সর্বদা ৫×১ ঘরে লিখতে হবে এবং একটি অক্ষর হতে অন্য আরেকটি অক্ষর হতে অন্য আরেকটি অক্ষর ১ ঘর প্রস্থের দিকে ফাঁকা দিতে হবে। কিন্তু A এর পরে S অক্ষরটি A এর ডান বাহুর সমান্তরাল উপরের লাইনে লিখে যেতে হবে। একটি শব্দ হতে অন্য আরেকটি শব্দ ১ অক্ষর পরিমান বা প্রস্থে ৫ ঘর ফাঁকা দিতে হবে।

ইংরেজি ব্লক টাইপ লেখা

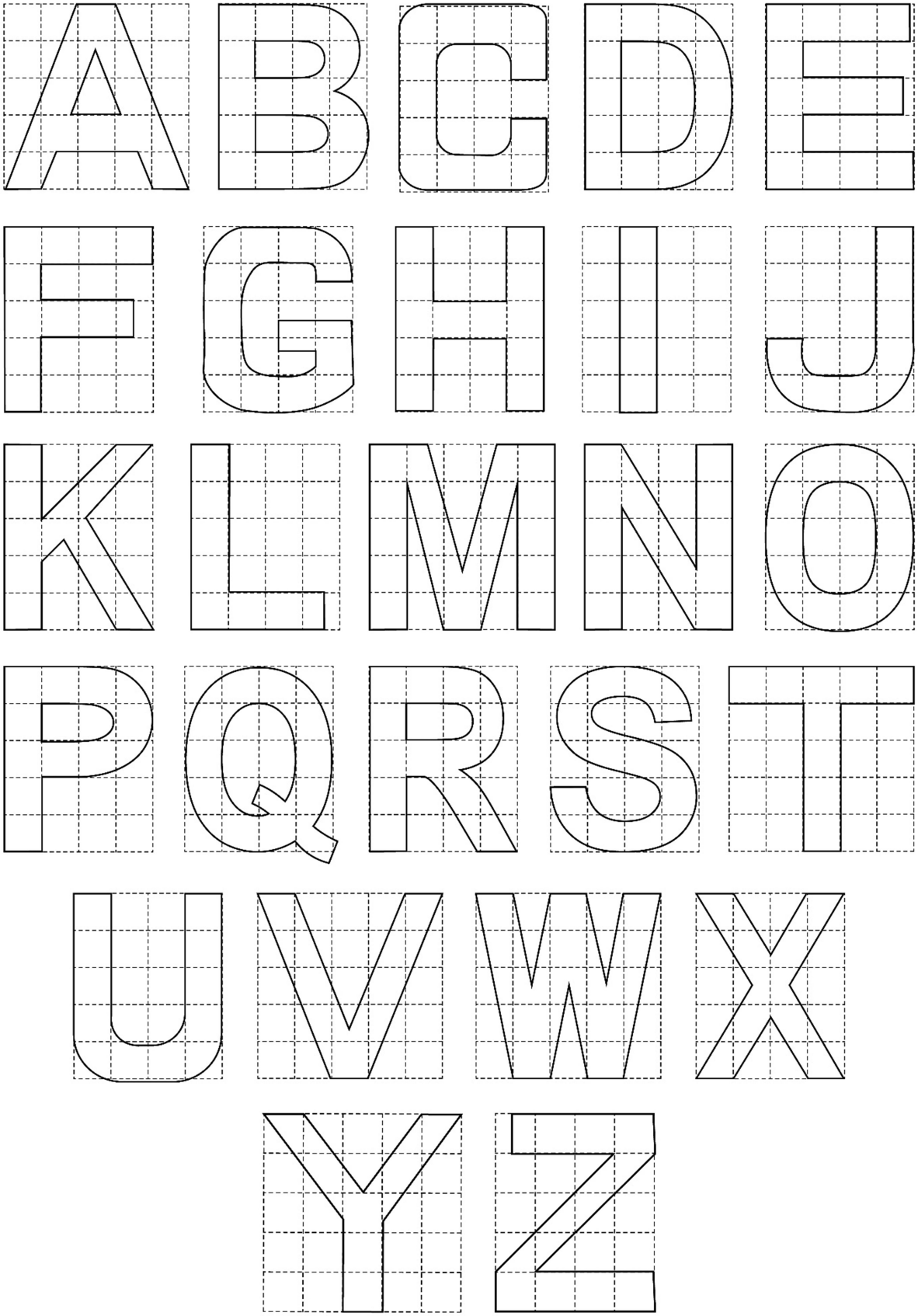

৭। **ইংরেজী ফ্লাট টাইপঃ** ইংরেজী যে সমস্ত লেখা বা অক্ষরগুলো উচ্চতার চেয়ে প্রস্থে বেশী করে লেখা হয় তাকে ইংরেজী ফ্লাট টাইপ লেখা বলে।

৮। **ফ্লাট টাইপ লেখার প্রয়োজনীয়তাঃ** ব্লক লেখার পাশাপাশি ফ্লাট টাইপ লেখা ও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সাধারণত যে সমস্ত জায়গা দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান সে অনুপাতে রেখা যদি সমান সংখ্যক হয় তার উপর ভিত্তি করে ব্লক টাইপ লেখা কিনলে স্থানের ও লেখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এমন কতগুলি স্থানে এমন কিছু লেখা লিখতে হয়, যেখানে জায়গা বেশী অথচ সে অনুপাতে লেখা বা অক্ষর কম। এ ক্ষেত্রে উক্ত স্থানটিতে ভরাট করে প্রস্থে বেশী জায়গা হওয়া উচিত। তাহলে কম লেখার মাধ্যমে ও প্রস্থে বেশী জায়গা দখল করা যেতে পারে। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় এখানে ফ্লাট টাইপ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

৯। **ইংরেজী ফ্লাট টাইপ লেখার নিয়ম ঃ** ইংরেজী ফ্লাট টাইপ লেখার নিয়ম ও প্রায় ব্লক টাইপ লেখার নিয়মের মতই। ব্লক অক্ষরের বেলায় যেমন ঘর বা বর্গ গুলিকে বর্গকৃতি করতে হয়। তেমনি ফ্লাট টাইপ লেখার বেলায় ঘর গুলি ঐ রূপে করতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, শুধু মাত্র প্রস্থে বেশি ঘর নিয়ে লিখতে হয়। ইংরেজী ফ্লাট অক্ষরের জন্য উচ্চতায় ৫ ঘর এবং প্রস্থে ৮ ঘর অর্থাৎ ৫×৮ ঘরে লিখতে হবে। তবে কিছু কিছু অক্ষর যেমন (A, M, T, V, W, Y) এই অক্ষরগুলো (৫×৯) ঘরে লিখতে হবে এবং একটি অক্ষর হতে অন্য আরেকটি অক্ষর ১ ঘর প্রস্থের ফাঁকা দিতে হবে। কিন্তু A এর পরে T অক্ষরটি এর ডান বাহুর সমান্তরাল উপরের লাইনে লিখতে হবে। ১টি শব্দ হতে অন্য আরেকটি শব্দ ১ অক্ষর প্রস্থে ফাঁকা দিতে হবে।

ইংরেজি ফ্ল্যাট টাইপ

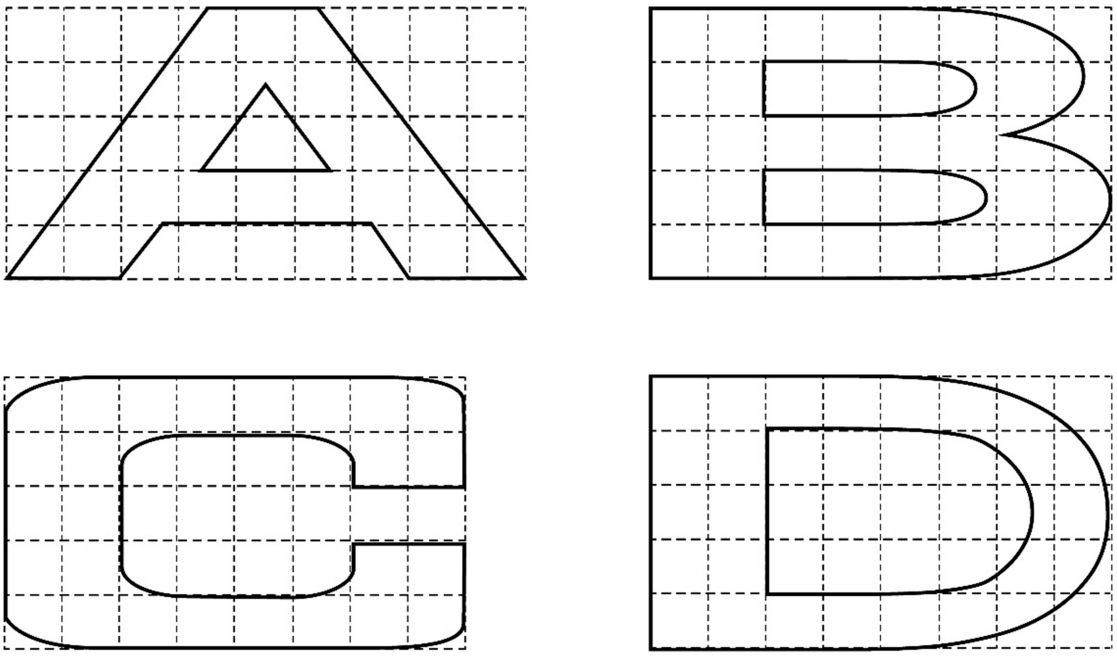

১০। <u>ইংরেজী ন্যারো টাইপ লেখার সংজ্ঞাঃ</u> ইংরেজী যে সমস্ত লেখা বা অক্ষর প্রস্থের চাইতে উচ্চতায় বেশী করে লেখা হয় তাকে ইংরেজী ন্যারো টাইপ লেখা বলে।

১১। <u>ইংরেজী ন্যারো টাইপ লেখার প্রয়োজনীয়তাঃ</u> ইংরেজী ন্যারো টাইপ লেখা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন কারণ এমন কতগুলি ড্রইং করতে হয়, সেখানে ব্লক ও ফ্লাট টাইপ লেখা সম্ভব নয়, অর্থাৎ যেখানে কাগজ বা বোর্ডে চওড়া কম থাকে এই সমস্ত স্থানে আমরা ন্যারো টাইপ লেখা লিখে থাকি। ন্যারো টাইপ লেখা আমরা যেখানে উচ্চতা বেশী চওড়া কম থাকে সেখানে লিখি। কারণ যা লেখার প্রয়োজন তার চাইতে কাগজ বা বোর্ডের প্রস্থ কম থাকে। এই সমস্থ স্থানে ন্যারো টাইপ লেখা লিখে থাকি। এই লেখার অক্ষর গুলি উচ্চতায় বেশী জায়গা লাগে এবং পাশে কম জায়গা লাগে।

১২। <u>ইংরেজী ন্যারো টাইপ লেখার নিয়মঃ</u> ইংরেজী ন্যারো টাইপ লেখার নিয়ম ও প্রায় ব্লক ও ফ্লাট টাইপ লেখার নিয়মের মতই। ব্লক অক্ষরের বেলায় যেমন ঘর বা বর্গ গুলিকে বর্গাকৃতি করতে হয়, তেমনি ন্যারো লেখার বেলায় ও ঘরগুলি ঐ রুপ করতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র উচ্চতায় বেশী ঘর নিয়ে লিখতে হবে। যেমনঃ A, M, T, V, W, Y এই অক্ষরগুলি ৯/৫, ১১/৫, ১৩/৫ ঘরে লিখতে হবে।

<u>ইংরেজি ন্যারো টাইপ</u>

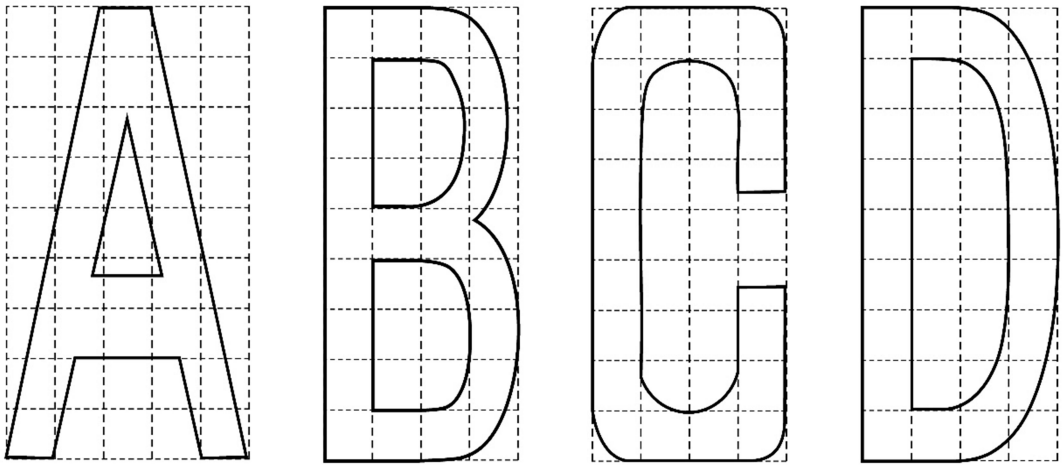

১৩। <u>শিক্ষনীয় বিষয়ঃ</u> লক্ষ্য রাখতে হবে যে I অক্ষরটি সর্বদা ৯/১ ঘরে লিখতে হবে এবং একটি অক্ষর হতে অন্য অক্ষর এক ঘর প্রস্থের দিকে ফাঁকা দিতে হবে। কিন্তু A এর পরে T অক্ষরটি এর ডান বাহুর সমান্তরাল উপরের লাইনে লিখতে হবে। ১টি শব্দ হতে অন্য আরেকটি শব্দ ১ অক্ষর প্রস্থে ফাঁকা দিতে হবে।

ষ্টেনসিল কাটার পদ্ধতি

১। **ষ্টেনসিল কাটিং এর সংজ্ঞাঃ** একই লেখা বার বার বিভিন্ন স্থানে দ্রুত এবং কম সময়ের মধ্যে একই সাইজের লেখা ছাপ দেয়ার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে ষ্টেনসিল কাটিং বলে।

২। **ষ্টেনসিল কাটিং এর প্রকারঃ** ষ্টেনসিল কাটিং ২ প্রকারঃ যথা।

ক। স্থায়ী ষ্টেনসিল কাটিং।
খ। অস্থায়ী ষ্টেনসিল কাটিং।

৩। **স্থায়ী ষ্টেনসিল কাটিংঃ** দীর্ঘ দিন অধিক কাজ করার জন্য যে সমস্ত উপকরণে স্টেনসিল কাটা হয় তাকে স্থায়ী স্টেনসিল কাটিং বলে। যেমন-টিন, প্লেনসিট, তামা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ।

৪। **অস্থায়ী স্টেনসিল কাটিংঃ** স্বল্প সময়ে অল্প কাজ করার জন্য যে সমস্ত উপকরণে স্টেনসিল কাটা হয় তাকে অস্থায়ী স্টেনসিল কাটিং বলে। যেমন-মোটা কাগজ, আর্ট পেপার ইত্যাদি।

৫। **স্টেনসিল কাটার প্রয়োজনীয়তাঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সকল ধরনের লেখার ষ্টেনসিল এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানে বাংলা লেখার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে। কিন্তু বাংলা সংখ্যা লিখন এর কোন সরঞ্জাম এখনো তৈরী হয়নি। এক্ষেত্রে একজন যোগ্য ড্রাফটস্‌ম্যানকে লেখার কাজগুলি সমাধান করতে হয়। একই লেখা কোন জিনিসের উপর বহু বার লিখার ক্ষেত্রে ষ্টেনসিলের বিকল্প নেই। কারণ একই লেখা বার বার নিজের হাতে লিখতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সুন্দর ভাবে খুব দ্রুত লেখার ক্ষেত্রে ষ্টেনসিল কাটার প্রয়োজনীয়তা অনেক। এতে করে সময় বাঁচে, লেখা সুন্দর হয় ও একই ষ্টেনসিল এর সাহায্যে বহুদিন লিখার কাজ করা যায়।

৬। **সংখ্যা/ অক্ষর স্টেনসিল কাটিং পদ্ধতিঃ** প্রথমে কাগজ, টিন বা প্লেন সিট নিতে হবে। লাইন দুটি এমন হতে হবে যা সংখ্যা বা অক্ষরের চওড়া কতটুকু হবে সে অনুপাতে এর ঘর তৈরী করে নেয়া ভাল। উচ্চতা এবং চওড়া নির্দিষ্ট ঘরটির সমান হবে। এভাবে প্রত্যোকটি ঘর সমান করে তারপর সংখ্যা বা অক্ষর গুলি লিখতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে সব সংখ্যা বা অক্ষরের মাথা মোটা সেগুলির মাথা মোটা রাখতে হবে এবং যে স্থান চিকন তা চিকন রাখতে হবে। সংখ্যা বা অক্ষর লেখার সময় সংখ্যা বা অক্ষর গুলি হালকা পেন্সিল ওয়ার্ক করতে হবে। তারপর পেন্সিল ওয়ার্ক করা লেখা বা অক্ষর গুলোকে জোড়া রাখার জন্য সমান্তরাল লাইন টেনে ব্লক করে নিতে হবে। যাতে বাকী অংশ গুলো কাটিং করলে সংখ্যা বা অক্ষরগুলো স্পষ্ট বুঝা যায়। এবার স্টেনসিল কাটা হলে কালি/পেইন্টকে স্পঞ্জের টুকরার সাথে মিশিয়ে স্টেনসিলের উপর ছাপ দিতে হবে। ফলে স্টেনসিলের নিচে ফুটে উঠবে স্টেনসিল কাটা সংখ্যা বা অক্ষর।

স্টেনসিল কাটিং পদ্ধতি

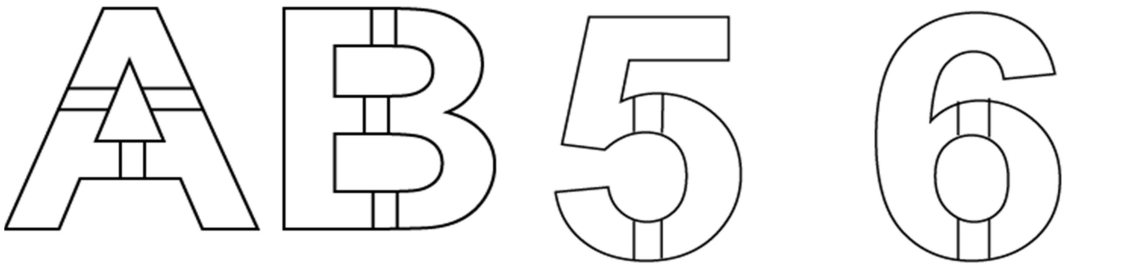

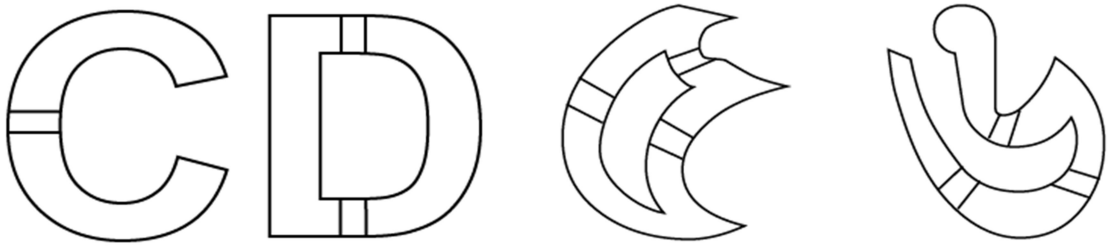

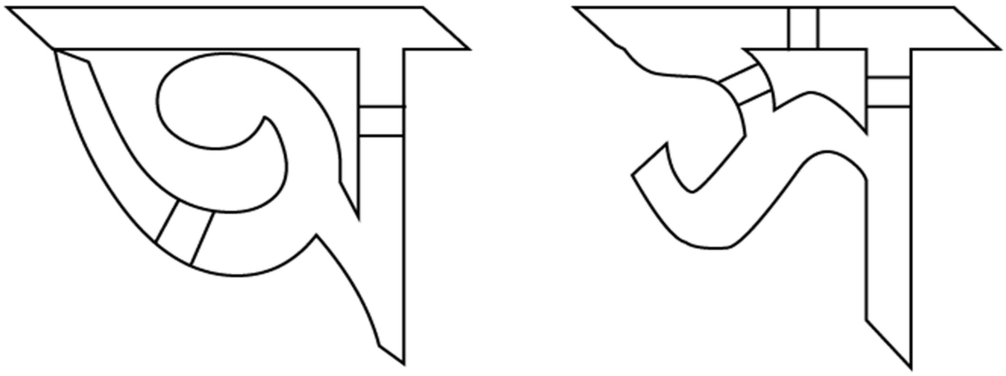

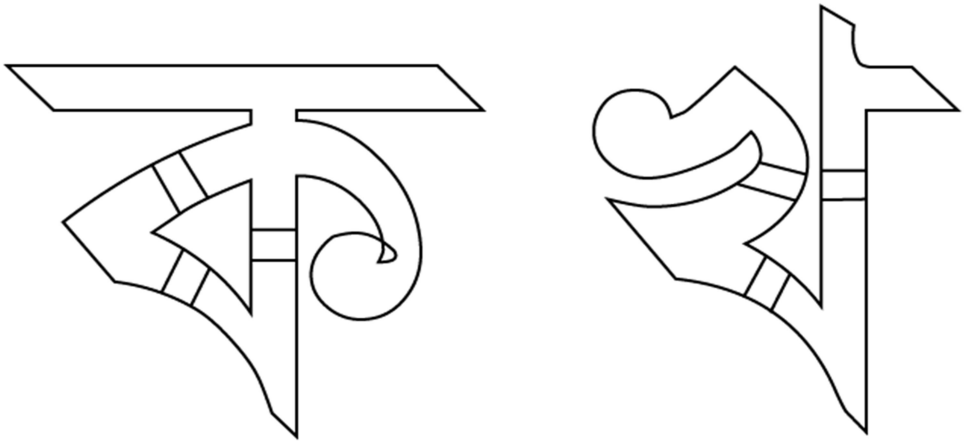

কর্কশীট এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্ম্পকে আলোচনা

১। **কর্কশীট কি ঃ** ইহা সাদা নরম জাতীয় ভংগুর হালকা এক প্রকার বস্তু যা মেশিনের সাহায্যে তৈরী করা হয়ে থাকে। ইহা ওজনে অনেক পাতলা হয়ে থাকে। যুগের পরিবর্তনে ও সময়ের প্রেক্ষাপটে কর্কশীটের চাহিদা দিন দিন অনেক বেড়েছে।

২। **কর্কশীটের প্রকারভেদ ঃ** কাজের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে কর্কশীট বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমনঃ

ক। ০.৫ ইঞ্চি
খ। ০.৭৫ ইঞ্চি
গ। ১ ইঞ্চি
ঘ। ১.৫ ইঞ্চি
ঙ। ২ ইঞ্চি
চ। অন্যান্য সাইজের ও বাজারে পাওয়া যায় ।

৩। **কর্কশীটের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বঃ** কর্কশীটের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ঋতু বৈচিত্রের এদেশে সারা বছরই নানা উৎসব লেগেই থাকে। তার সংঙ্গে রয়েছে জন্মদিন, গায়ে হলুদ ও বিয়ে প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে সাঁজানোর কাজে ব্যবহার করা হয় কর্কশীট। নানা রং, ডিজাইন কাটিং আর বিভিন্ন ধরনের চুমকির ব্যবহার করে কর্কশীট দ্বারা করা হয় নানা ধরনের ডিজাইন। কখনও তৈরী করা হয় বাঘের মুখ,পুতুল ঘোড়া,ঢোল,তবলা,হাতি,ফুল,পাখি আল্পনাসহ নানা ধরনের ডিজাইন কারুশিল্প তৈরী করা হয় ঈদ, পূঁজা,গায়ে হলুদ, নববর্ষের বিশেষ বোর্ড। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি সুশৃংখল বাহিনী এ বাহিনীতে আমরা সারা বছর অনেক ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকি। যেমনঃ

ক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
খ। চিল্ডেন ক্লাবের অনুষ্ঠান।
গ। পহেলা বৈশাখ।
ঘ। বিভিন্ন প্রকার দরবার।
ঙ। ঈদ পূর্ণমিলনী।
চ। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।
ছ। লেডিস ক্লাবের অনুষ্ঠান।
জ। সেপক্সের বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

৪। **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ** সেনাবাহিনী যেমন সুশৃংখল তেমনি আনন্দ প্রিয় বটে। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন লোকেশনে অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। সে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য-বর্ধনের জন্য কর্কশীটের আল্পনা তৈরী করা হয় ও কর্কশীট দিয়ে অনুষ্ঠানের নাম লেখা হয়।

৫। **লেডিস ক্লাবের অনুষ্ঠানঃ** সেনাবাহিনীতে লেডিস ক্লাবে প্রতি মাসে ১/২ টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সাইজের কর্কশীট নানা প্রকার আল্পনা তৈরী করেও অনুষ্ঠানের নাম লিখে জরি ব্যবহার করে অনুষ্ঠানকে আরো আকর্ষনীয় করে তোলা হয়।

৬। **সেনা পরিবার কল্যান সমিতি (সেপক্স) ঃ** সেনাবাহিনীতে সেনা পরিবার কল্যান সমিতিতে যে অনুষ্ঠান গুলো হয়ে থাকে সে গুলো কর্কশীটের আলপনা ও অনুষ্ঠানের নাম লিখে তা জরি দিয়ে অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে তোলা হয়।

৭। **চিলড্রেন ক্লাবঃ** বাচ্চাদের মেধা বিকাশ ও আনন্দের জন্য চিল্ডেন ক্লাবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেখানে বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য কর্কশীট দিয়ে তৈরী করা হয় প্রজাপ্রতি,ফুল,বাঘের মাথা,ঘাস ফড়িং ইত্যাদি তৈরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়।

৮। **পহেলা বৈশাখঃ** পহেলা বৈশাখ বাঙালী জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান তাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এই অনুষ্ঠান অনেক যাক-জমক করে পালন করা হয়ে থাকে। একদিকে পহেলা বৈশাখের আনন্দ অন্যদিকে এই আনন্দকে আরো দ্বিগুন করে তোলে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গান নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। আর এই অনুষ্ঠানকে সাজ স্বজ্জা করার জন্য ব্যবহার করা হয় নানান সাইজের কর্কশীটের আল্পনা। এই আল্পনা গুলোকে বিভিন্ন রং করে জরি ব্যবহার করে তোলে এক একটি এক এক রকম ডিজাইন।

৯। **ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানঃ** বাংলাদেশ মুসলীম প্রধান দেশ। তাই মুসলমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলো ২ টি ঈদ। প্রতিটা মুসলমান ঈদকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতেও এই অনুষ্ঠানকে করে অনেক জমকালো ভাবে পালন করা হয়। আর এই জমকালো ভাবে পালন করার জন্য বিভিন্ন স্থানে সাজানো হয় আর এই সাজানো কাজে ব্যবহার করা হয় কর্কশীটের বিভিন্ন আল্পনা, মনোগ্রাম, সৌন্দর্য বর্ধক ছবি ইত্যাদি। আর রং তুলির আঁচড়ে কর্কশীটের আকা শিল্পগুলো হয়ে উঠে আরো বর্ণিল। কাজের ধরন ও প্রয়োজনীয়তা হিসাব করে কর্কশীটের গুরুত্ব ও চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।

কর্কশীটের বিভিন্ন প্রকার লেখা সম্পর্কে আলোচনা ও কাটার পদ্বতি

১। **কর্কশীট কিঃ** কর্কশীট হলো এক ধরনের নরম ও হালকা জাতীয় বস্তু যা মেশিনের দ্বারা তৈরি। এতে রয়েছে কেমিক্যাল ও বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রনে তৈরী। যাহার দ্বারা সাজসজ্জা করা যায়। আর এ সকল বস্তু সমূহকে কর্কসীট বলে। যুগের পরিবর্তে ও সময়ের প্রেক্ষাপটে কর্কশীটের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।

২। **কর্কশীট লেখার প্রকারঃ** সেনাবাহিনীতে সাধারনত তিন ধরনের লেখা হয়ে থাকে।

যেমনঃ ক। ব্লক টাইপ লেখা।
খ। ফ্ল্যাট টাইপ লেখা।
গ। ন্যারো টাইপ লেখা।
এছাড়া আরো ২ টি উপায়ে কর্কশীট লেখা হয়। যেমন।

ক। আর্টিষ্টিক ভাবে।
খ। ইঞ্জিনিয়ারিং ভাবে।

৩। **কর্কশীটে লেখার নিয়মঃ** বাংলা অক্ষর বা লেখাগুলোকে নিদিষ্ট মাপনীতে নিয়ম অনুসারে সুন্দরকরে ডাবল লাইনে পেন্সিলের সাহায্যে মার্কিং করে কর্কশীট কাটার দ্বারা কাটা হয়। আমাদের দেশে তথা সেনাবাহিনীতে সারা বছর নানা প্রোগ্রাম লেগেই থাকে। তার সংঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে সাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয় কর্কশীট। কর্কশীট ডিজাইন করে সাজানো স্থানকে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়। কর্কশীটে লেখা বাংলা অক্ষর লেখার একই।কর্কশীট দ্বারা লিখতে হলে প্রথমে যে স্থানে লেখাগুলো লাগানো হবে সেখানে প্রথমে মাপ অনুসারে লেখা তৈরী করতে হবে। কর্কশীট ডানে বামে ৪ টি সমান্তরাল লাইন টানতে হবে। ৪ টি লাইনের মধ্যে ৩ টি ঘর উৎপন্ন হবে ১ম ও ২য় লাইনের মাঝের ঘরকে মাত্রা ঘর বলে। ২য় ও ৩য় লাইনের মাঝের ঘরকে অক্ষর ঘর বলে। ৩য় ও ৪র্থ উৎপন্ন ঘর কে কৌনিক ঘর বলে। তবে মাত্রা ঘরের মোটাই এর সমান হবে অক্ষরের বাহুর মোটাই। অক্ষর গুলো প্রথমে পেন্সিলের সাহায্যে লিখতে হবে। যা কর্কশীট কাটার দিয়ে অক্ষর গুলো কেটে সুন্দর করার জন্য বিভিন্ন রকমের রং ব্যবহার করতে হয়। কর্কশীটের সাথে ব্রাশ, প্লাস্টিক রং, জল রং ব্যবহার করে আইকা ঘাম দ্বারা বিভিন্ন কালার জড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে লেখা গুলোকে আরো সুন্দরকরে তোলা যায়।কর্কশীট দ্বারা অসংখ্য লেখা তৈরি করা যায়। অক্ষর লেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আল্পনাও তৈরী করা হয়।

৩। **কর্কশীটে লেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ** বর্তমান যুগে বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর গুলো কর্কশীট দিয়ে লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কাজে যেমন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এছাড়াও দরবার, বিদায়ী অনুষ্ঠান,সেপকস,লেডিস ক্লাবে অনুষ্ঠানসহ নানা রকম অনুষ্ঠানে কর্কশীট দিয়ে লেখা হয়ে থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এ দৃশ্য নির্ভূল হইলেও লিখতে কর্কশীটের অক্ষর গুলো যদি সুন্দর ও বিধি সম্মত না হয় তাহলে ঐ ড্রইং এর উৎকৃশষ্টতা অনেকাংশে কমিয়ে যায়। এই কারনে দৃশ্য অংকনের ন্যায় লিখতে হয়।

৪। **কর্কশীট দিয়ে আল্পনা কাঁটার পদ্বতিঃ** কর্কশীটের আল্পনার ব্যবহার সেনাবাহিনীতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। প্রথমে হেসকো ব্লেড বা চাকু লেদ মেশিন দ্বারা বা কেচির সানঘড় থেকে কর্কশীট কাটার বানিয়ে নিতে হবে। যার শেষ অংশ কিছুটা চিকন হয়ে শেষ হয়ে যাবে।এবার কর্কশীট কাটার স্থান নির্বাচন করতে হবে। তারপর আল্পনা পরিমাপ করে সেই পরিমানে কর্কশীট কেটে নিতে হবে। তারপর আল্পনা কাটার জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে, কর্কশীটের আল্পনা যেন সুচারুরুপে সুনিপুন ভাবে কাটতে হয়। আল্পনা কাটা শেষ হলে কর্কশীট যেহেতু সাদা জাতীয় বস্তু সেহেতু রং এর ব্যাবহার করে প্লাষ্টিক পেইন্ট দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্বি করা যাবে।

ড্রইং ও ড্রইং এর প্রকারভেদ ও বর্ণনা

১। **ড্রইংঃ** কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি হুবুহু স্কেল অনুযায়ী কাগজের উপর অংকন করাকে ড্রইং বলে।

২। **ড্রইং এর প্রকারভেদঃ** ড্রইং মূলত ২ প্রকারঃ যথা।

ক। আর্টিষ্টিক ড্রইং।
খ। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং।

৩। **আর্টিষ্টিক ড্রইংঃ** কোন ব্যক্তি বা শিল্পির চাক্ষুস বা কাল্পনিক কোন বস্তুর গঠন বৈচিত্রকে বিভিন্ন চিত্রাংকন দ্রব্যের সাহায্যে সেই বস্তুর শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধ চিত্র অংকন করা কে আর্টিষ্টিক ড্রইং বলে।

৪। **ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংঃ** ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এমন একটি ভাষা যাহা কোন বস্তুগুলো রেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই ভাষা সর্বজনীন স্বীকৃত এবং অন্যান্য ভাষার মত এই ভাষায় নিজস্ব ব্যাকরনগত নিয়ম কানুন আছে। তা এই রেখা চিত্রের ড্রইং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিশিয়ানরা বুঝতে পারেন বলেই ইহাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং বা টেকনিশিয়ানদের ভাষা বলা হয়।

৫। **ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং এর প্রকারভেদঃ** বিভাগ বা শাখার ভিত্তিতে ড্রইং ৩ প্রকার। যথা।

ক। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং (স্থাপত্য ড্রইং)।
খ। ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং (যন্ত্রাংশ ড্রইং)।
গ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং (বৈদ্যুতিক ড্রইং)।

৬। **সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংঃ** ব্রীজ,বিল্ডিং,রোড,ফার্নিচার জাতীয় বস্তুর ড্রইংকে সিভিল ড্রইং বলে। অর্থাৎ এই জাতীয় স্থাপনা বস্তুর অর্থগ্রাফিক প্রজেকশনের মাধ্যমে পরিমাপসহ অংকিত ড্রইং যাতে সেই বস্তুর পূর্ণাঙ্গ,নির্ভূল পরিষ্কার ও সহজ বোধগম্য হয় এই রুপ ড্রইং।

৭। **ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংঃ** মেশিন,ইঞ্জিন,জেনারেটর, ইত্যাদি যন্ত্র জাতীয় বস্তু বা যন্ত্রাংশের ড্রইং কে ম্যাকানিক্যাল ড্রইং বলে। অর্থাৎ কোন ম্যাকানিক্যাল বস্তুর অর্থগ্রাফিক প্রজেকশনের মাধ্যমে পরিমাপসহ অংকিত ড্রইং যাতে সেই বস্তুর পূর্ণাঙ্গ,নির্ভূল পরিষ্কার ও সহজ বোধগম্য হয় এই রুপ ড্রইং।

৮। **ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংঃ** ইলেকট্রিক্যাল বা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পদ্ধতি বিষয়ক ড্রইং অর্থাৎ ইলেকট্রিক ওয়ারিং বা সংযোগ পদ্ধতির নির্দেশিত ড্রইংকে ইলেকট্রিক্যাল ড্রইং বলে।

৯। **ড্রইং এর লক্ষনীয় বিষয়ঃ**

ক। প্রথমে ড্রইং সীটের চারদিকে বর্ডার লাইন দিতে হবে ।
খ। কাগজে সেন্টার লাইন বাহির করে ড্রইং করতে হবে।
গ। কাগজের উপরে এমন জায়গা রাখতে হবে যাতে শিরোনাম লেখা যায়।
ঘ। যে জিনিসের ড্রইং করতে হবে প্রথমে প্রধান অংশগুলি ড্রইং করতে হবে, পরে ছোট অংশগুলি ড্রইং করতে হবে।
ঙ। একদিক থেকে ড্রইং শুরু করে ড্রইং শেষ করতে হবে।
চ। প্রথমে পেন্সিলের সাহায্যে ড্রইং করতে হবে। যাতে কোন প্রকার ভূল ত্রুটি হলে সংশোধন করা যায়।
ছ। ড্রইং শেষ হলে পুনরায় দেখতে হবে যে, কোন জায়গা বাদ আছে কিনা যদি বাদ থাকে পুনরায় সম্পন্ন করতে হবে।
জ। ড্রইং এর কাজ পুরোপুরি শেষ হলে যদি রং এর ব্যবহার থাকে তাহলে রং করতে হবে।

বক্স পেপার দিয়ে বক্স তৈরী ও র‍্যাপিং করা

১। **ভূমিকাঃ** বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের সৈনিকদের বক্স বানানোর ভূমিকা অপরিসীম। যা আমরা যথারীতি অনুশীলন করে থাকি।

২। **বক্স পেপারের সংজ্ঞাঃ** বক্স পেপার হলো এক ধরনের মোটা কাগজ বা আর্ট পেপার। যে কাগজ দ্বারা আমরা বিভিন্ন সাইজের বক্স তৈরি করে থাকি তাকে বক্স পেপার বলে।

৩। **র‍্যাপিং এর সংজ্ঞাঃ** র‍্যাপিং হলো এক ধরনের কাগজ যা দ্বারা আমরা বিভিন্ন ধরনের গিফটকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য এই পেপার বা কাগজ দ্বারা মোরক বা প্রোলেব করে থাকি একেই র‍্যাপিং বলে।

৪। **বক্স তৈরী করণ পদ্বতিঃ** প্রথমে বক্স পেপারটিকে সমান্তরাল জায়গায় বিছাতে হবে। যদি বক্সটির দৈর্ঘ্য ১০´´ প্রস্থ ৫´´ উচ্চতা ৩´´ হয়। তবে দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে ৩´´+১০´´+৩´´ এভাবে বক্স পেপারে পেন্সিল দ্বারা দাগ টানতে হবে। প্রস্থের ক্ষেত্রে ৩´´+৫´´+৩´´+৫´´+৩´´ এভাবে বক্স পেপারে পেন্সিল দ্বারা দাগ টানতে হবে। তারপর চাকুর উল্টা পাশের সাহায্যে দাগ টেনে ভাজ করে নিতে হবে এবং অতিরিক্ত অংশ গুলি এন্টিকাটার এর সাহায্যে কেটে নিয়ে তাহা ভাজ করে বক্স তৈরি করতে হবে।

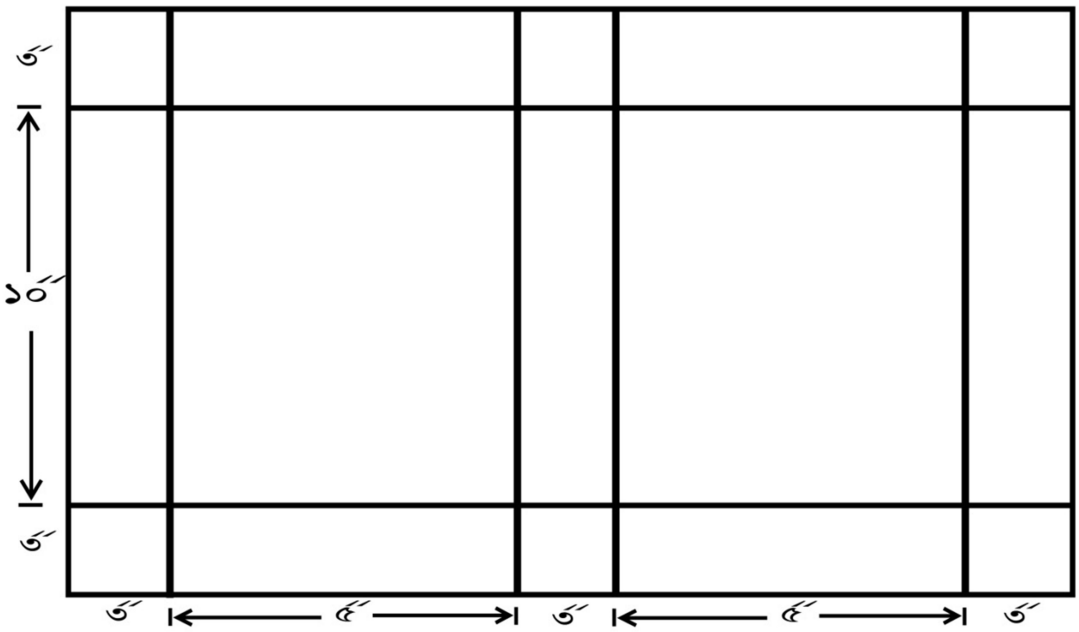

চিত্রঃ মাপসহ বক্স বোর্ড পেপারের চিত্র

৫। **উপসংহার।** পরিশেষে বলতে চাই, অদ্যকার পাঠে এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। তাই আমাদের ড্রাফটস্‌ম্যান এর প্রত্যেকটি সদস্যকে এ বিষয়ে অভিঙ্গ হওয়া জরুরী।

আলপনা তৈরীকরণ

১। **ভূমিকাঃ** আলপনা বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির একটি পরিচিত নাম। আলপনা বলতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানান রেখা আর রঙের নকশা। গায়ে হলুদ, বিয়ে, বসন্ত বরণ বা নববর্ষে আয়োজন যেন পূর্ণতা পায় না আলপনা ছাড়া। আলপনায় ফুটে ওঠে মনের বিশুদ্ধতম প্রতিফলন। আলপনা শিল্পের সূচনা হয়েছিল অনেক প্রাচীনকালে। অনেক প্রাচীন পোড়ামাটির টেরা কোটায় পাওয়া যায় আলপনার উপস্থিতি। বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখে ও আলপনার ব্যবহার ছিল প্রাচীন কাল থেকেই। সেই ধারাবাহিকতা এখনও রয়েছে।

২। **সেনাবাহিনীতে আলপনার প্রয়োজনীয়তাঃ** প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে আলপনার বিকল্প নেই। সুতরাং সেনাবাহিনীতে আলপনার গুরুত্ব অত্যাধিক।

৩। **আলপনার উপকরণঃ** আলপনা তৈরীতে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমনঃ
কাঠ, বাঁশ, কর্কশীট, রং, তুলি, গ্লিটার, আর্ট পেপার ইত্যাদি ।

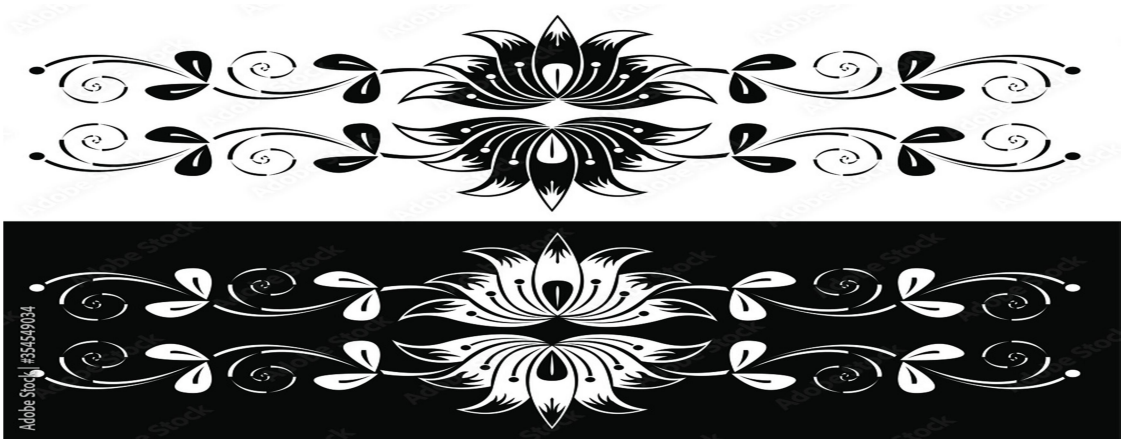

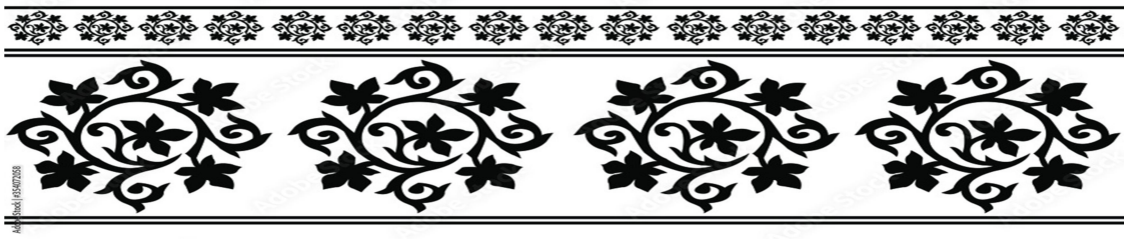

৪। **উপসংহারঃ** পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আলপনার কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। এবং আলপনার কাজে রং করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন রং আশে পাশে না যায়।

ম্যাপের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য, উদ্ধাংশ, নিম্নাংশ, সীমাবদ্ধতা, যত্ন ও রক্ষনাবেক্ষণ

১। **ভূমিকাঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ম্যাপের গুরুত্ব অপরিসীম। যুদ্বকালীন ও শান্তিকালীন সময়ে আমরা কোন এলাকার অবস্থা সমন্ধে জানতে ম্যাপ ব্যাবহার করে থাকি। তাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ম্যাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। **মানচিত্রের সংজ্ঞাঃ** ম্যাপ বা মানচিত্র প্রকৃত ছবির মতো নয়। একে উপর হতে দেখলে যেমন দেখায়, সেরুপ ম্যাপকে ভূমির সাংকেতিক প্রতিচ্ছবি বলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সার্ভে বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত রং এর ব্যাবহারের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তু সমূহকে নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে কোন এলাকার ভূমির প্রকৃত অবস্থা ক্ষুদ্রাকারে কাপড় বা কাগজের উপর নির্দিষ্ট মাপনীতে প্রকাশ করাকে ম্যাপ বা মানচিত্র বলে।

৩। **মানচিত্রের প্রকারভেদঃ** ম্যাপ কে সাধারনত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক। সাধারন ম্যাপ।
খ। বিশেষ ম্যাপ।

৪। **সাধারণ ম্যাপ ০৩ প্রকারঃ** যথা।

ক। **এ্যাটলাস ম্যাপঃ** এ ম্যাপ গুলো অন্ত্যত ছোট মাপনীর। এ্যাটলাস ম্যাপে সারাদেশ এমনকি সমস্ত পৃথিবী একই সীটে অংকিত থাকে। সাধারনতঃ এ সমস্ত ম্যাপে ভৌগলিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। ম্যাপ রিডিং এর ক্ষেত্রে এই ম্যাপ ব্যাবহৃত হয় না।

খ। **স্থান বিবরনী ম্যাপঃ** প্রধানত ম্যাপ রিডিং এর জন্য এই সমস্ত ম্যাপ ব্যবহৃত হয়। ভূমির প্রকৃত ছবি প্রকাশই এ সব ম্যাপ প্রস্তুতির উদ্দেশ্য। এগুলোতে সাধারন ব্যবহার যোগ্য মাপনী ব্যবহৃত হয়।

গ। **প্ল্যান ম্যাপঃ** এগুলোতে অনেক বড় মাপনী ব্যবহৃত হয়। যাতে সম্পূর্ণ ভালোভাবে প্রকাশিত হয়। সাধারণত বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ কোন সাময়িক কাজের জন্য এ ম্যাপগুলো ব্যবহৃত হয়।

৫। **বিশেষ ম্যাপঃ** যাতায়াত ম্যাপ,সড়ক ম্যাপ,বন্ধুরতা নির্দেশক ম্যাপ, ফটোম্যাপ ইত্যাদি এ ধরনের ম্যাপ। যা শুধু স্ব স্ব কাজের জন্যই ব্যবহৃত, সামরিক ম্যাপ রিডিং এ এদের কোন গুরুত্ব নেই।

৬। **ম্যাপের বৈশিষ্ট্য।**

ক। একে সার্ভে করার সময় ভূমিতে বিদ্যমান বস্তু সমূহের সাংকেতিক প্রতিরূপ।
খ। স্থানের স্বল্পতাহেতু অনেক কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।
গ। এতে রণকৌশলের গুরুত্ব সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য থাকে।
ঘ। ছোট এবং সংকীর্ণ বস্তু সমূহের প্রকৃত আকার ঠিক থাকে না।
ঙ। বিভিন্ন উপায়ে ভূমির বন্ধুরতা প্রকাশ পায়।
চ। প্রতিটি ম্যাপ প্রান্তিক নির্দেশাবলী সম্বলিত।

৭। **ম্যাপের উদ্ধাংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখিত থাকেঃ**

ক। জেলার নাম।
খ। নিরাপত্তার শ্রেনী বিভাগ।
গ। প্রস্তুতির উৎস।
ঘ। দেশের নাম।
ঙ। সংস্করণ।
চ। উত্তর দিক সমূহের পার্থক্য।
ছ। ম্যাপ সীট নং।

৮। **ম্যাপের নিম্নাংশে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো উল্লেখিত থাকেঃ**

ক। নিবন্ধন সংখ্যা।
খ। সাংকেতিক চিহ্নের নির্দেশাবলী।
গ। ম্যাপের বরাত।
ঘ। ম্যাপের নির্ঘন্ট।
ঙ। প্রকাশকের নাম ও পদবী।
চ। সাল।
ছ। মাপনী (কথায় এবং আনুঃ ভগ্নাঃ)।
(১) মাপনী রেখা (ফালং)।
(২) মাপনী রেখা (গজ)।
(৩) মাপনী রেখা (মিটার)।

জ। সম্মোনিত রেখার পার্থক্য (বিশেষ ক্ষেত্রে)।
ঝ। প্রস্তুতির বিস্তারিত তথ্যাবলী।
ঞ। জোন পরিচিতি।
ট। প্রশাসনিক সীমারেখা।
ঠ। মুদ্রণের স্থান।
ড। সাংকেতিক চিহ্নের নির্দেশাবলী
ঢ। সর্বস্বত্ব অধিকারী।
ণ। মূল্য।

৯। **ম্যাপের সীমাবদ্ধতাঃ**

ক। ম্যাপ ভূমির তুলনায় ছোট ফলে ভূমির প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা যায় না।
খ। কোন ম্যাপই অত্যাধুনিক নয় বিধায় ভূমির বর্তমান অবস্থার প্রকৃত প্রতিচ্ছবির সাথে ম্যাপ গরমিল পরিলক্ষিত হয়।
গ। ম্যাপ সমতল কিন্তু পৃথিবী গোলাকার ও এর পৃষ্ঠ অসমতল।
ঘ। সার্ভেয়ারের ভুলের জন্য ইহা ক্ষেত্র বিশেষ ভুল মুদ্রিত হতে পারে।
ঙ। অধিকাংশে ক্ষেত্রে ম্যাপে অংকিত সাংকেতিক চিহ্নসমূহ মাপনী অনুযায়ী হয় না।

১০। **ম্যাপের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায়ঃ**

ক। ভূমি রেকীর (পর্যবেক্ষন) মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য ম্যাপে সংযোজন বা বিয়োজন করে ।
খ। এয়ার ফটোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকায় ছবি থেকে প্রয়োজনীয় নতুন তথ্য সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে।
গ। জরিপ বিভাগের সর্বশেষ তথ্যের মাধ্যমে।

১১। **ম্যাপের যত্ন ও রক্ষনাবেক্ষণঃ** কেনো কোনো ম্যাপের নীচের দিকে কাপড় লাগানো থাকে। তবে অধিকাংশ ম্যাপই শুধু কাগজের উপর প্রস্তুত। এজন্য ম্যাপ অত্যন্ত দূর্বল ও ভংগুর। অতি যত্নের সাথে সাবধানে ব্যবহার না করলে অল্প দিনেই ম্যাপ নষ্ট হয়ে যাবে। অল্প ছেড়া ম্যাপ শীঘ্রই মেরামত করা উচিত ম্যাপ কেস না থাকলে ম্যাপকে এমন ভাবে ভাজ করা উচিৎ যেন ব্যবহারের সময় সমস্ত ম্যাপটিকে বারবার খুলতে না হয়।

ম্যাপের গ্রিড লাইনের সংজ্ঞা ও মিলিটারী গ্রিড সিস্টেমে লক্ষ্যবস্তুর স্থানাংক নির্ণয়

১। **ভূমিকাঃ** সেনাবাহিনীর সদস্যগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। পার্বত্যময় অঞ্চলে এমন অনেক জায়গা আছে যাহা দিক ও দূরত্ব ঠিকরাখা সম্ভব নয়। তখনই দিক ও দূরত্বের জন্য কম্পাস ও ম্যাপের প্রয়োজন অত্যাধিক। ম্যাপ থাকিলেই দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব নয়, যদি না ম্যাপের স্থানাংক সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে। এই জন্য ম্যাপের গ্রীড ও স্থানাংক সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেক সৈনিকের জ্ঞান থাকিতে হইবে।

২। **উদ্দেশ্যঃ** আজকের পাঠের মূখ্য উদ্দেশ্য হইল মিলিটারী গ্রিড সিস্টেমে চার রাশি ও ছয় রাশি ফিগার জিআর নির্ণয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

৩। **গ্রীড লাইনের সংজ্ঞাঃ** ম্যাপের উপরে অংকিত লাল বা বেগুনি রং এর রেখাগুলি যাদের নম্বর পশ্চিম হতে পূর্বে এবং দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে বৃদ্ধি পেয়ে অসংখ্য বর্গ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে তাকে গ্রীড লাইন বলে।

৪। **গ্রীড লাইনের প্রকারভেদঃ** গ্রীড লাইন দুই প্রকার। যথা।-

ক। ইষ্টিং লাইন
খ। নর্দিং লাইন

৫। **ইষ্টিং লাইনঃ** ম্যাপের উপরে অংকিত উত্তর হতে দক্ষিনে সমান্তরাল খাড়া রেখাগুলি যার নম্বর পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তাকে ইষ্টিং লাইন বলে।

৬। **নর্দিং লাইনঃ** ম্যাপের উপরে অংকিত পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে সমান্তরাল পরা রেখাগুলি যার নম্বর দক্ষিন হতে উত্তর দিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তাকে নর্দিং লাইন বলে।

৭। **মিলিটারি গ্রিড সিস্টেমঃ** উত্তর দক্ষিণে অংকিত রেখাগুলির নম্বর পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে বৃদ্ধি পায় বলিয়া এই রেখা গুলিকে ইষ্টিং লাইন বলে। আর পূর্ব-পশ্চিমে অংকিত রেখা গুলির নম্বর দক্ষিন দিক হইতে উত্তর দিকে বর্ধিত হয় বলিয়া উহাদিগকে নর্দিং লাইন বলে।

৮। **চার রাশির স্থানাংক কাহাকে বলেঃ** যে বর্গক্ষেত্রের স্থানাংক দিতে হবে, প্রথমে এর বামদিকস্থ ইস্টিং লাইনের নম্বর ও পরে এর ভূমিস্থ নর্দিং লাইনের নম্বর লিখতে হবে। এক ইঞ্চি ম্যাপে গ্রিড লাইনের নম্বর দুই রাশিতে থাকায় উক্ত বর্গক্ষেত্রের স্থানাংক চার রাশিতে হয়। এরূপ স্থানাংককে চাররাশি স্থানাংক বলা হয়।

৯। **চার রাশির স্থানাংক ছকের মাধ্যমে নির্ণয় পদ্ধতিঃ** স্থানাংক নির্ণয়ের নিয়ম নিম্নে বর্ণিত ছকটি হতে সহজেই বুঝা যায়। এ ছকের যে কোন স্থানে যেতে হলে শুধু এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পথেই এতে প্রবেশ করা যায়। এর প্রত্যেকটি সড়কের নাম রাশি দ্বারা রাখা হয়েছে। উক্ত ছকের কোন বর্গক্ষেত্রে যেতে হলে এর নিকটস্থ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের চৌরাস্তাটিতে পৌঁছাতে হবে। যেমন- মসজিদে যাওয়ার জন্য মোটর গাড়ীটি ১৩ নং সড়ক ও ৪২ নং সড়কের চৌরাস্তা পর্যন্ত যাবে। অথবা একে ১৩৪২ চৌরাস্তাও বলা যায়। ম্যাপে সড়কের স্থলে গ্রিড লাইন অঙ্কিত আছে। এ নিয়মেই গ্রিড লাইনগুলোর সাহায্যে ম্যাপে কোন স্থানের স্থানাংক দেয়া থাকে। উপরোক্ত মসজিদের স্থানাঙ্ক ১৩৪২। ইহা চাররাশি স্থানাংক।

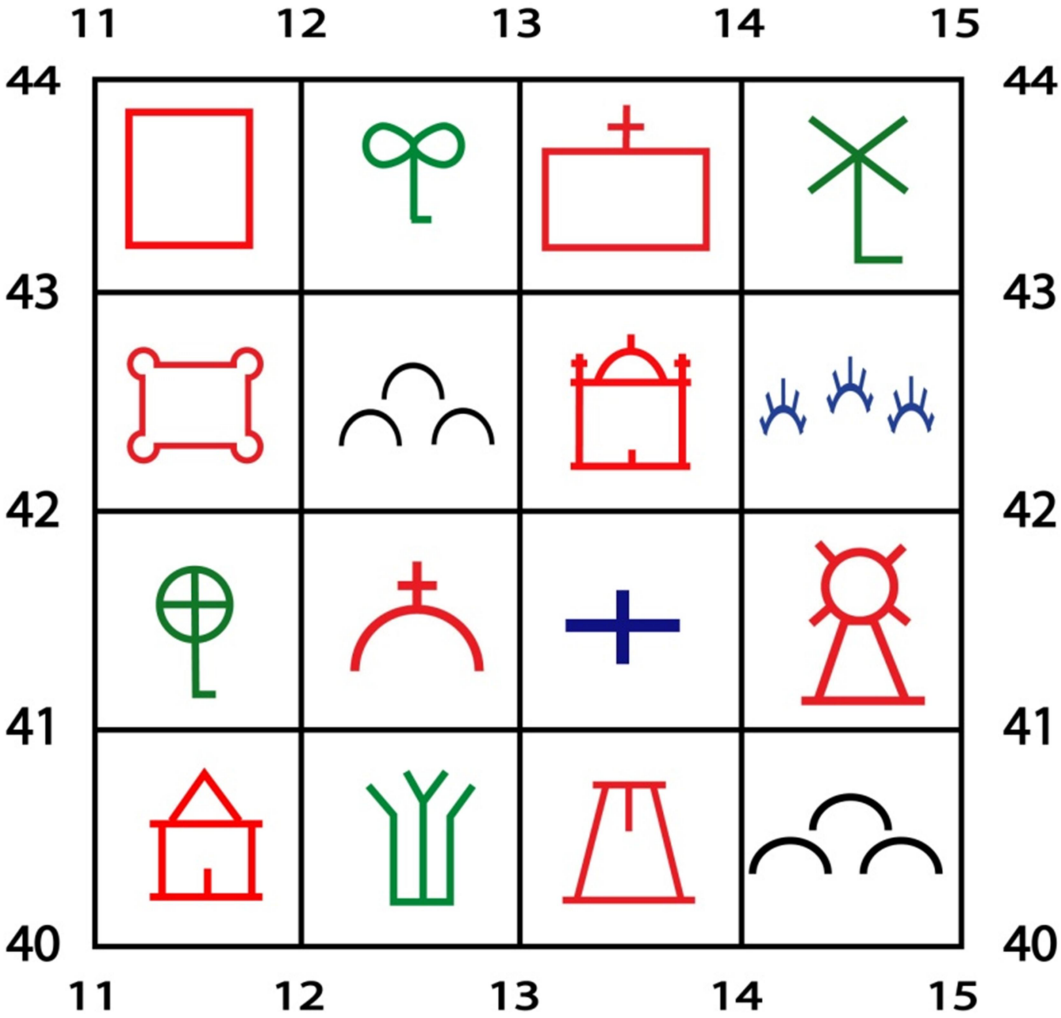

চিত্রঃ চার রাশির স্থানাংক ছকের মাধ্যমে নির্ণয় পদ্ধতি

১০। **ছয় রাশির স্থানাংক কাহাকে বলেঃ** কোন নির্দিষ্ট বস্তুর স্থানাংক লেখার সময় দেখতে হবে যে, ইহা ইষ্টিং লাইন হতে ডানদিকে কত দশমাংশ দূরে আছে। ইষ্টিং লাইনের নম্বর এর সাথে উক্ত রাশিটি লিখতে হবে। একইভাবে নর্দিং লাইনের নম্বরের সাথে এর উত্তরের দশমাংশ রাশিটি লিখতে হবে। এভাবে চার রাশির বর্গক্ষেত্রের নির্দিষ্ট স্থান বা বস্তুর স্থানাংক ছয় রাশিতে হবে। একে ছয়রাশি স্থানাংক বলা হয়।

১১। **ছয় রাশির স্থানাংক ছকের মাধ্যমে নির্ণয় পদ্ধতিঃ** নীচের ম্যাপের সবচেয়ে বামদিকের ঘরটির ছয়রাশি স্থানাংক লেখার জন্য ইষ্টিং লাইনের নম্বর ৬৫ ও ৪ দশমাংশ এবং নর্দিং লাইনের নম্বর ৩২ ও ১ দশমাংশ মিলিয়ে ৬৫৪৩২১ লিখতে হবে। এভাবে উক্ত ঘরটিকে ১০০ গজের মধ্যে পাওয়া যাবে।

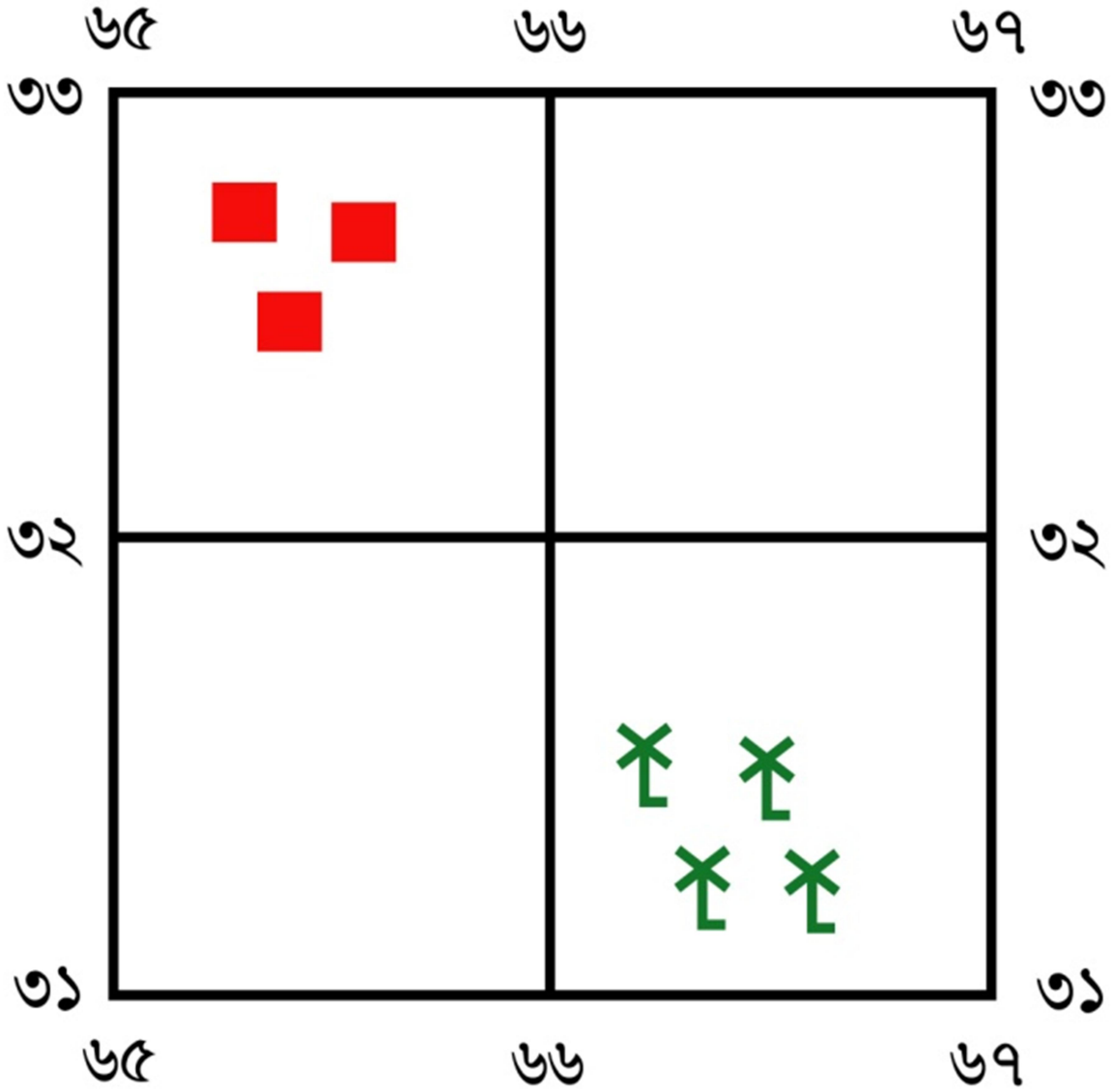

চিত্রঃ ছয় রাশির স্থানাংক ছকের মাধ্যমে নির্ণয় পদ্ধতি

ম্যাপের নির্ঘন্ট

ভূমিকাঃ আমাদের ব্যক্তি জীবন বা সামাজিক জীবনে চতুর পার্শ্বের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা যেমন অপরিহার্য তেমনি একজন সৈনিকের পেশাগত কার্য সম্পাদনে তার চারিপাশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেনাবাহিনী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মানচিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তাই কোন ম্যাপের চারিদিকের ম্যাপগুলো কি হবে তা জানার জন্য ম্যাপের নির্ঘন্ট সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত অপরিহার্য।

প্রয়োজনীয় সংজ্ঞাসমূহঃ

ক। ম্যাপের নির্ঘন্টঃ ম্যাপের পূর্বাপর সীট নম্বর যে পদ্ধতি বা নিয়ম অনুসৃত হয়ে পরিবর্তিত হয় তাকে ম্যাপের নির্ঘন্ট বলে। অর্থাৎ যে ধারাবাহিকতা অবলম্বনে কোন ম্যাপের চতুষ্পার্শ্ব ম্যাপ সংযোজন করা হয় তাকে ম্যাপের নির্ঘন্ট বলে।

খ। ম্যাপ সীট নম্বরঃ ম্যাপ ব্যবহারের সুবিধার্থে ম্যাপকে সহজে এবং দ্রুত চিনিবার জন্য বা নির্দেশ করার জন্য যে নম্বর ব্যবহার করা হয় তাকে ম্যাপ সীট নম্বর বলে।

গ। মিলিয়ন শীট নম্বরঃ ৪ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ X ৪ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পরিমিত এলাকার ম্যাপকে মিলিয়ন শীট ম্যাপ বলে।যার আঃ ভঃ ১ ঃ ১০,০০০০০। উক্ত মিলিয়ন শীট ম্যাপের জন্য যে নম্বর বরাদ্দ করা হয় তাকে মিলিয়ন শীট নম্বর বলে।

ঘ। মিলিয়ন সীট ম্যাপঃ একটি সহজ এবং পদ্ধতিগত নিয়ম অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকার মানচিত্রকে নম্বারকৃত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীকে কতগুলো অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলের আলাদা আলাদা উৎপত্তি স্থল বা আরম্ব বিন্দু রয়েছে। বাংলাদেশ ও ইহার পার্শ্বস্থ দেশ সমূয়ের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলটির উৎপত্তি স্থল ৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মিলন স্থল। এই উৎপত্তি স্থানের পূর্বে ও উত্তরে এশিয়া মহাদেশের যে অঞ্চলটি অবস্থিত ইহাকে ৪ ডিগ্রি অক্ষাংশ×৪ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে।

মিলিয়ন সীটের নম্বর ও ম্যাপের নম্বর একসাথে মিলিয়ে সিকি ইঞ্চি ম্যাপের সীট নম্বর লিখতে হয়। যেমন ৭৯/জি। সিকি ইঞ্চি ম্যাপে ইস্টিং ও নর্দিং গ্রীড লাইনের নম্বর শুধু এক রাশিতে প্রকাশ হয়ে থাকে। এ ম্যাপে প্রত্যেকটি বর্গকে ১০ হাজার গজ×১০ হাজার গজ এবং আঃ ভঃ ১ঃ২,৫০,০০০ নম্বর দেওয়া হয়েছে। উহাধিকে মিলিয়ন সীট নম্বর বলে। ১ উক্ত ৪ ডিগ্রী×৪ ডিগ্রী ম্যাপকে মিলিয়ন সীট ম্যাপ বলে। উহার আঃ ভঃ ১ঃ১০,০০,০০০। বাংলাদেশের একটি মিলিয়ন সীট ম্যাপের নম্বর ৭৯। উল্লেখিত অঞ্চলের অন্যান্য ছোট মানচিত্রের ম্যাপ সীট নম্বরের প্রথম সংখ্যাটির মিলিয়ন সীটের নম্বর প্রকাশ করে ।

৭৮	৮৩
৭৯	৮৪

বাংলাদেশের মিলিয়ন সীট নম্বর

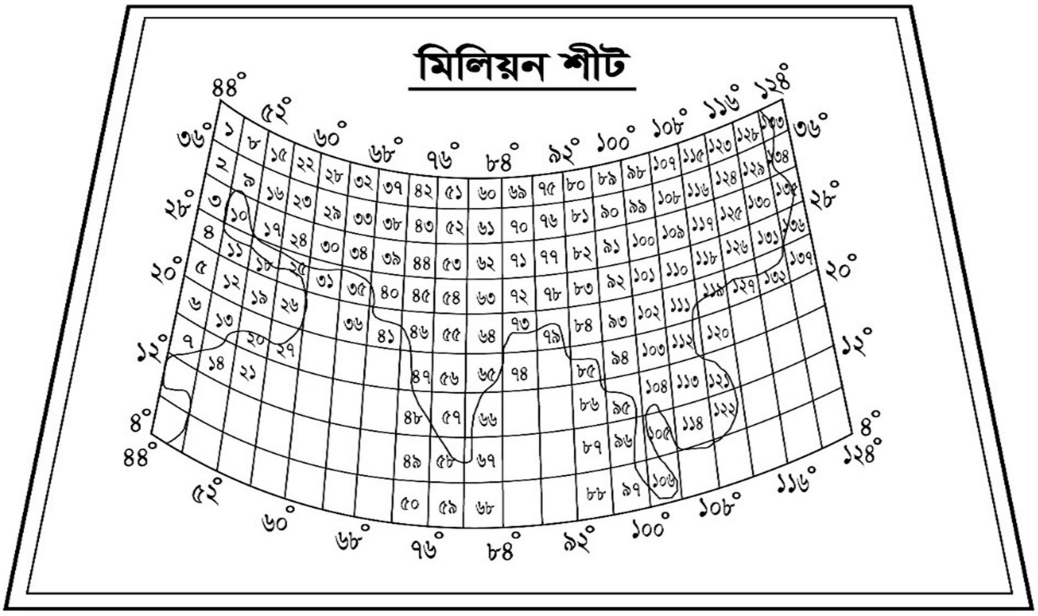

ঙ। **সিকি ইঞ্চি ম্যাপঃ** প্রত্যেক মিলিয়ন সীট ম্যাপকে (৪ ডিগ্রী×৪ ডিগ্রী), ১ ইঞ্চি×১ ইঞ্চি ম্যাপের ১৬টি ছোট ম্যাপে বিভক্ত করা হয়েছে। এ ম্যাপ গুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে ইংরেজি অক্ষর (A) ইহাতে (P) পর্যন্ত ক্রমান্নয়ে নম্বর দেওয়া হয়েছে। এরূপ ম্যাপকে সিকি ইঞ্চি ম্যাপ বলে।

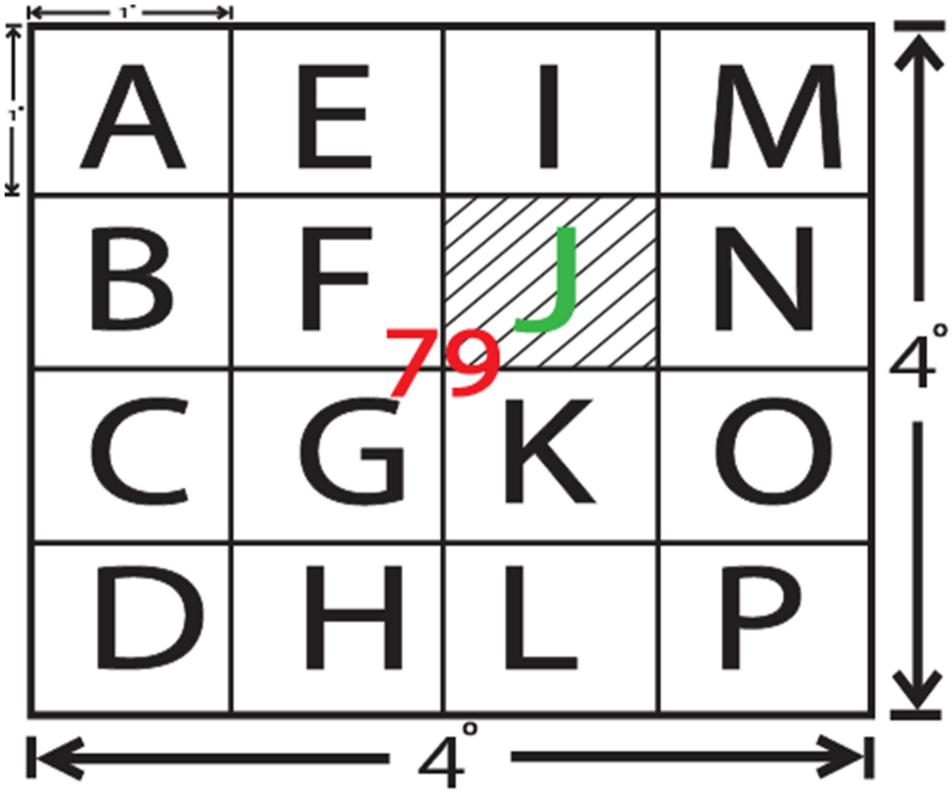

চ। **<u>১ ইঞ্চি ম্যাপঃ</u>** প্রত্যেক সিকি ইঞ্চি ম্যাপকে (১ ডিগ্রী×১ ডিগ্রী), ১৫ ইঞ্চি×১৫ ইঞ্চি ম্যাপের ১৬টি অংশে বিভক্ত করে যা ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত ক্রমান্নয়ে নম্বর দেওয়া আছে। এরূপ ম্যাপকে ১ ইঞ্চি ম্যাপ বলে।

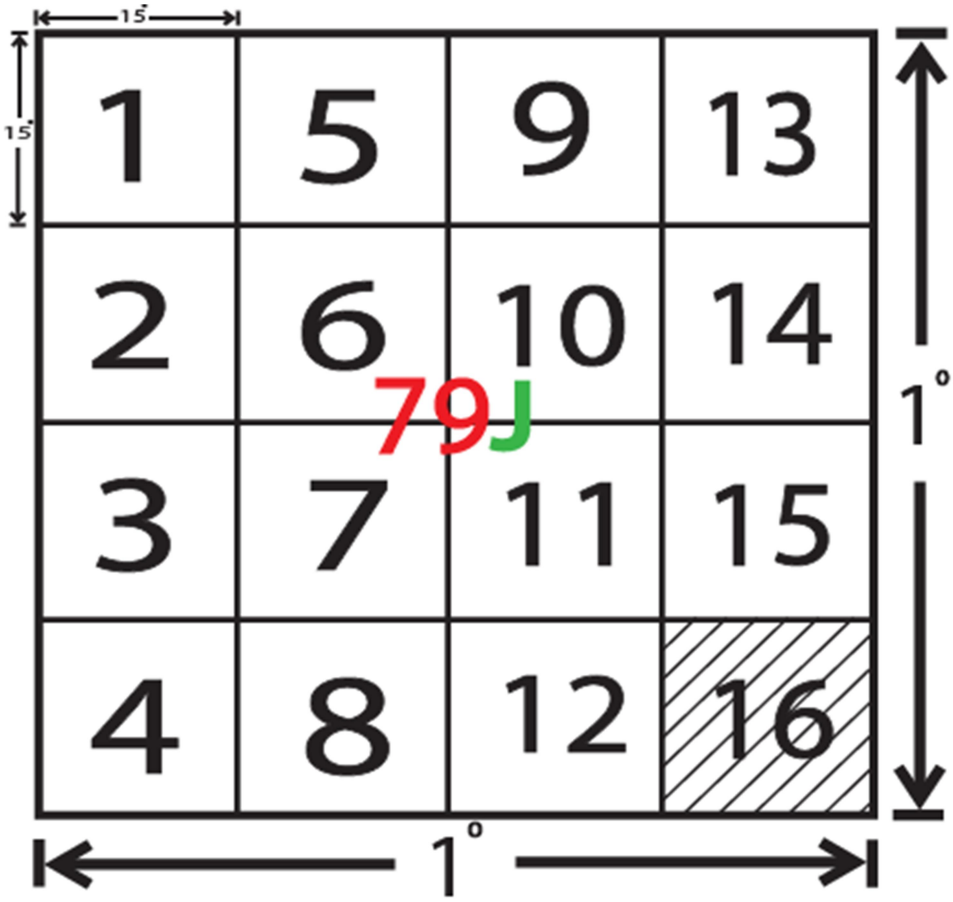

ছ। **<u>ম্যাপসীট নম্বরের প্রয়োজনীয়তাঃ</u>** সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত মানচিত্রের কোন এলাকার নির্দিষ্ট পরিমাপের জায়গাকে উপস্থাপনা করা হয়। প্রয়োজনে ব্যাপক এলাকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একাধিক মানচিত্রের দরকার। এ সমস্ত মানচিত্রকে যথাযথ সংযোজনের জন্য প্রতিটি মানচিত্রের পরিচিতি অপরিহার্য্য ম্যাপ সীট নম্বর প্রতিটি মানচিত্রের সঠিক পরিচয় বহন করে। ম্যাপ সীট নম্বর জানা থাকলে ম্যাপের নির্ঘন্টের সাহায্যে ইহার আশেপাশের সীট নম্বর গুলো সমন্ধে জ্ঞান পাওয়া যায়।

জ। **<u>উপসংহারঃ</u>** উপরিউক্ত আলোচনার মতে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এটা এমন একটি অধ্যায় বা চিত্রের সাহায্যে উল্লেখ রয়েছে সুতরাং এ বিষয়ের উপর সবার সম্মুখ ধারনা রাখা আবশ্যক। তাই আমাদের জ্ঞান আহরণ করা উচিত তখনি যখন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়।

মডেলের পরিচিতি ও বর্ণনা

১। **মডেলের সংজ্ঞাঃ** ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহকে কাগজ, গ্রাউন্ড সীট এবং মাটির উপর অপেক্ষাকৃত বড় আকার সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা অংকন করাকে মডেল বলে।

২। **মডেলের প্রকারভেদঃ** মডেল সাধারণত তিন প্রকার। যথাঃ

ক। সেন্ড মডেল।
খ। ক্লথ মডেল।
গ। স্থায়ী মডেল।

৩। **সেন্ড মডেলঃ** যে কোন স্থানে মডেলই ভূমির সাথে পরিচয় করে দেয়। ইহা তৈরী করতে বেশি টাকা ও সময়ের প্রয়োজন হয়। ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিকরা ইহা সঠিক ভাবে তৈরী করতে পারে। সেন্ড মডেল যে কোন লেভেলে তৈরী করা সম্ভব। ইহা মাটির উপর বালি দ্বারা তৈরী করা হয়। সেন্ড মডেল তৈরী করতে হলে নির্দিষ্ট নকশা বা স্কেচ ম্যাপ হইতে জায়গা নির্দিষ্ট করতে হবে। যে জায়গা নির্দিষ্ট করবে মডেলের উপর হুবহু তেমনই তৈরী করতে হবে। নকশা হইতে যে জায়গা নির্দিষ্ট করবে তাহা যেন সহজেই স্কেল পরিবর্তন করা যায়। নকশা বা স্কেচকে এমনভাগে ভাগ করতে হবে যেন প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্র পরস্পর সমান হয়। এই কাজকে সহজ করা জন্য নকশার উপর গ্রীড লাইন দিতে হবে। নকশার বর্গক্ষেত্র গুলি সেন্ড মডেলের উপর স্থাপন করতে হবে।

৪। **ক্লথ মডেলঃ** ইহা অতি সহজেই তৈরী করা যায়। ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন স্থানে বহন করা যায়। ইহা বেশি বড় হইলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সময়ের অপচয় হয়। কিন্তু যখন কোন অপারেশনের জন্য ক্লথ তৈরী করা হয় তখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। ইউনিট লেভেলে গ্রাউন্ডসীট, কম্বল এই গুলির উপর চক দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লথ মডেল তৈরী করা সম্ভব। তখন অবশ্যই রংগীন চক ব্যবহার করিতে হইবে। বিশেষ কোন প্রয়োজন না হইলে ক্লথ মডেল ইউনিটে বানানো হয় না।

৫। **স্থায়ী মডেলঃ** স্থায়ী মডেলের জন্য প্লাই-উড অথবা প্লাষ্টিক ব্যবহার হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সিমেন্ট এবং বালি দ্বারা স্থায়ী প্লানিং এর উপর স্ট্যাটিক এইচ কিউ এ তৈরী করা হয়। অথবা যখন কোন মিলিটারী স্কুল, মিলিটারী ইনিষ্টিটিউট এ আলোচনার প্রয়োজন পরে, তখন এই মডেলের ডিটেইলস কে স্থায়ী ভাবে তৈরী করিয়া রাখা হয়।

৬। **মডেল তৈরীর লক্ষ্যনীয় বিষয়ঃ** মডেল তৈরীর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখিতে হইবেঃ

ক। সমস্ত সমস্যাগুলি মডেলের সাথে জড়িত থাকতে হবে। মডেলের সাহায্য ব্যতিত যে সমস্ত সমস্যা আছে তাহা ইনডোরে আলোচনা করা হয়ে থাকে।
খ। যে সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারা যায় বলে মনে হয় উহাকে মডেলের ভিতর সংযোগ করতে হবে।
গ। প্রায় নানা প্রকার সমস্যা নানা ভাবে দেখা দেয় যেমন কোম্পানী লেভেলে, ব্যাটালিয়ন লেভেলে, ব্রিগেড লেভেলে ইত্যাদি সমস্যা ব্যক্ত করে সমাধান করতে হবে।
ঘ। মডেলের ভিতর এডমিন এর গুরুত্ব অপারেশনের ভিতর থাকতে হবে। এই সমস্যা ঐ আলোচনার সময় বেশীক্ষণ স্থায়ী করা যাবে না।
ঙ। মডেলের ভিতর কোন প্রকার খামখেয়ালী চলবে না।

৭। **মডেলে ব্যবহৃত সরঞ্জামঃ** মডেলের সরঞ্জাম নিম্নরুপঃ

ক। ম্যাপ।
খ। কম্পাস।
গ। ফিতা $\frac{১}{২}$,$১\frac{১}{২}$ ।
ঘ। পাট।
ঙ। সুতা (সাদা ও লাল)।
চ। রং বিভিন্ন ধরনের।
ছ। বালি।
জ। বালিকে টেম্পিং করার জন্য টেম্পিং বল।
ঝ। গেতি ও বেলচা।
ঞ। লিকুইড কালার বিভিন্ন প্রকার।
ট। কাগজ, বালি, কাঠের গুড়া, বাঁশের কাঠি, হেয়ার পিন, পেপার পিন ইত্যাদি।

৮। **মডেল তৈরীকরণঃ** মডেল সাধারণত ৬ × ৪ × ১৮ × ১২ তৈরী করা হয়। গ্রিড লাইন এবং গ্রিড নং দিতে হবে। মডেলের উপর স্কেল অবশ্যই হতে হবে। স্কেল সব সময় গজে নিতে হবে। নর্থ লাগাতে হবে। সামান্য পানি দিয়া নির্দিষ্ট জায়গায় টেম্পিং করে ডিটেইলস লাগানোর জন্য লেভেল তৈরী করতে হবে। তারপর বড় বড় ডিটেইলস আগে পরে ছোট ছোট ডিটেইলস গুলি লাগাবে। পাকা রাস্তা, কাচা রাস্তা, গাছপালা ইত্যাদি অক্সাইড ও লিকুইড রং এর দ্বারা বিভিন্ন ডিটেইলস এ বিভিন্ন কালার লাগিয়ে তৈরী করতে হবে। এবং প্রত্যেকটি ডিটেইলস এ আলাদা আলাদা নাম লেখে লাগিয়ে দিতে হবে। যাহাতে প্রশিক্ষণের অসুবিধা না হয়।

ক্লথ মডেলের পরিচিতি ও বর্ণনা

১। **ক্লথ মডেলের সংজ্ঞাঃ** ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহকে কোন গ্রাউন্ড সীট, ছালার চট বা কাপড়ের মধ্যে হুবহু আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ভাবে ছোট/বড় আকারে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার রং এর সাহায্যে অংকন করার নামকে কাপড়ের মডেল বা ক্লথ মডেল বলে।

২। **সাধারন বর্ণনাঃ** কোন কাপড়ের বা হেসিয়ান ক্লথের বা গ্রাউন্ড সীটের মধ্যে নির্দিষ্ট এলাকার ম্যাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ম্যাপ ও ইহার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ম্যাপে ছোট আকারে এলাকা দেওয়া থাকে। যাহাতে সমস্ত স্থানের স্থান গুলি ভালভাবে বুঝা যায় না। সেই জন্য ক্লথ মডেলের সাহায্যে বড় আকারে তৈরী করে নির্দিষ্ট এলাকার সমস্ত জিনিস গুলিকে ভালভাবে বুঝানো যায়। ক্লথ মডেলের এমন একটি সুবিধা রয়েছে ইহাকে ভাজ করে যেকোন স্থানে সহজে বহন করা যায়। আবার প্রয়োজনে ইহা বিছিয়ে ইহার অবস্থান ও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দেখে আবার ভাজ করে যে কোন স্থানে রাখা যায়। ইহা নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা খুব কম।

৩। **মডেল তৈরীর সুবিধাঃ** মডেল তৈরীর সুবিধা সমূহ নিম্নরুপ। যথাঃ

ক। ইহা অতি সহজে তৈরী করা যায়।
খ। ইচ্ছামত যে কোন স্থানে বহন করা যায়।
গ। অল্প জায়গায় ব্যবহার করা যায়।
ঘ। যে কোন অবস্থায় ইহা সাথে রাখা যায়।
ঙ। পানি ও বৃষ্টিতে ইহা সহজে নষ্ট হয় না।
চ। ইহা ঘরের ভিতরে ঝুলাইয়া ব্যবহার করা যায়।
ছ। কাদা, ধুলা, বালি লাগলে ও পূনরায় ব্যবহার করা যায়।

৪। **ক্লথ মডেল ব্যবহারের সরঞ্জামঃ** একটি ক্লথ মডেল তৈরী করতে হলে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি অবশ্যই প্রয়োজন হয়।

ক। কাপড়/গ্রাউন্ড সীট।
খ। রংঙ্গীন চক বিভিন্ন রংয়ের।
গ। থ্রেডবল বা চিকন সুতা।
ঘ। টি সেট।
ঙ। সেট স্কয়ার।
চ। ম্যাপ।
ছ। পয়েন্টার ষ্টিক ইত্যাদি।

৫। **ক্লথ মডেল তৈরী করণ পদ্ধতিঃ** ক্লথ মডেল যেকোন স্থানে অতি অল্প সময়ে তৈরী করা যায়। মডেলটি কত টুকু হবে তাহা সর্ব প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে। তারপর কাপড়টি সোজা করে বিছাতে হবে। এই কাপড়টি ৬´× ১০´ হতে হবে

অথবা ৮´ × ১২´, ১০´× ১৪, ১৬´× ১২´ এবং ১২´× ১৮´ এইরুপ হতে পারে। এই মডেল গ্রাউন্ড সীটেও তৈরী করা যাইতে পারে। যে কোন একটি সাইজের কাপড় নিয়া ইহাকে মাটিতে বিছিয়ে স্থায়ী রং দ্বারা সর্ব প্রথম গ্রীড লাইন অংকনের পর গ্রীড নম্বর বসাতে হবে। তারপর নদী, নালা, খাল, বিল, পাকা রাস্তা, রেল লাইন, মসজিদ, মন্দির, গ্রাম, ঘরবাড়ী, বড় বড় গাছ ইহার মধ্যে অংকন করতে হবে। তবে পাকারাস্তা লাল রং, রেল লাইন কালো রং দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে ইহার ডানপার্শ্বে নর্থ লাইন ও ম্যাপের নীচে স্কেল অবশ্যই দিতে হবে। মডেল এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে মডেলটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে চওড়া হয়। তাহাতে মডেলের দিকগুলিও অবস্থানগুলি বুঝতে কোন রকমের অসুবিধা হবে না।বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে ম্যাপের প্রত্যেকটি বস্তু সঠিকভাবে মডেলের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। তবে ক্লথ মডেল মাপনী অনুযায়ী অথবা মাপনী বিহীন ও করা হয়ে থাকে।

চিত্রঃ ক্লথ মডেল তৈরী করণ পদ্ধতি।

চিত্রঃ ক্লথ মডেল তৈরী করণ পদ্ধতি

সেন্ড মডেলের পরিচিতি ও বর্ণনা

১। সেন্ড মডেলের সংজ্ঞাঃ ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তু সমূহকে অথবা ম্যাপের কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রতিচ্ছবি স্কেলের আনুপাতিক হার ঠিক রাখিয়া বড় আকারে মাটির উপর বালির সাহায্যে বিভিন্ন রং ও সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে ছোট কাঠের, প্লাষ্টিকের মডেল ব্যবহারে যে বালির মডেল তৈরী করা হয় তাহাকে সেন্ড মডেল বলে।ইহা শান্তিকালীন অথবা যুদ্ধকালীন সময়ে কোন এলাকার পরিচিতি অথবা যুদ্ধ পরিস্থিতি কিংবা নিজস্ব দলের বা শত্রুদলের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে এবং অপারেশন কার্যক্রম সঠিক ও নির্ভূল ভাবে পরিচালনা করতে সাহায্যে করে।

২। সেন্ড মডেল তৈরীর সরঞ্জামঃ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিকদের সেন্ড মডেল তৈরী করতে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জাম গুলির প্রয়োজন হয়।

ক। বালি।
খ। কাঠের গুড়া।
গ। বিভিন্ন কালার রং।
ঘ। নায়লন সুতা (চিকন)।
ঙ। বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি।
চ। গেতি, বেলচা এবং কোদাল।
ছ। প্লাষ্টিক এর ছোট গাছ পালার মডেল।
জ। কাঠের/প্লাষ্টিকের ঘর, ব্রীজ, বিল্ডিং এর ছোট মডেল।
ঝ। ম্যাপ ও কম্পাস।
ঞ। রিবন বিভিন্ন রংয়ের।
ট। বালির টেমপিং বল।
ঠ। কালি, কলম ও ড্রইং সীট।
ড। পয়েন্টার ষ্টিক।
ঢ। উঃ দিক নির্দেশক।
ণ। শিরোনামের বোর্ড।
ত। মাপনী বোর্ড।

৩। সেন্ড মডেল তৈরীকরণ পদ্ধতিঃ ম্যাপের যে অংশটি মডেল করতে হবে সেই অংশটিকে ভালোভাবে মার্কিং করে নিতে হইবে। সেই অনুপাতে যে স্থানে মডেল হবে সে স্থানের মাটিতে উত্তর দক্ষিণে ম্যাপের স্কেলের আনুপাতিক হারে সমান করে স্থানটি নায়লন সুতা/ট্রেসিং টেপ দ্বারা ব্লক করে দিতে হবে। এবার ব্লকের আয়ত ক্ষেত্রের ভিতরের মাটি ৬´´ পরিমান সরিয়ে ফেলতে হবে। মাটি লেভেল করে ১´´ পরিমান বালি দিতে হবে। তারপর বালির টেম্পিং বল দ্বারা বালিকে টেম্পিং করতে হবে। ম্যাপের গ্রীড লাইন অনুযায়ী (যে জায়গা পূর্বে নির্দিষ্ট করা আছে) বাঁশের কঞ্চি গেরে নায়লন সুতার সাহায্যে বর্গ তৈরী করে নিতে হবে। কাগজে গ্রীড নং লাগাতে হবে। অতপর ম্যাপ দেখে পয়েন্টারের সাহায্যে প্রথমে সরল বস্তুগুলো আগে অংকন করতে হবে। যেমন নদী, রাস্তা, রেল লাইন ইত্যাদি। প্রথমে নদী যেখান থেকে সুরু হয়েছে সেখান থেকে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিমান মাটিকে গর্ত করে বালি তুলে ফেলে দিতে হবে। রাস্তার বেলায় ১´´ পরিমান উঁচু করে কাদা মাটি দ্বারা রাস্তা তৈরী করে দিতে হবে। এভাবে এক এক করে ঘর, বাড়ী, ব্রীজ গাছপালা ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে। সম্পূর্ণ মডেল হয়ে গেলে মডেলের উপর শিরোনাম, নীচে মাপনী ও ডান পাশে উত্তর দিক নির্দেশনা লাগাতে হবে।

চিত্রঃ একটি আদর্শ সেন্ড মডেল

জিপিএস (Global Positioning System)এর সংজ্ঞা, পরিচিতি ও ব্যবহার প্রণালী

১। **ভূমিকাঃ** বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে জিপিএস এর গুরুত্ব অপরিসীম। জিপিএস এর মাধ্যমে খুব সহজেই কোন স্থানের স্থানাংক নির্ণয় করা যায়।

২। **জিপিএস এর সংজ্ঞাঃ** GPS হলো Global Possitioning System। ইহা গ্রহ পুঞ্জের ন্যায় বিন্যস্ত নেভিগেশন স্যাটেলাইট যা পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এ সমস্ত স্যাটেলাইট হতে প্রদানকৃত সূক্ষ্ম সময় এবং অবস্থানের তথ্য ব্যবহার করে জিপিএস রিসিভার কোন অবস্থানের স্থানাংক হিসাব করে থাকে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাকে জিপিএস বলে। ইহা অনবরত ২৪ ঘন্টা ব্যাপী পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন বস্তুর ত্রৈমাত্রিক তথ্য প্রদান করতে সক্ষম।

জিপিএস এর চিত্র ঃ MODEL: GPS NAVA F- 30 (BHC NAV)

৩। **ব্যাটারী ইনস্টল করার নিয়মঃ** নাভা জিপিএস F-30 চলে Li-ion ব্যাটারীর মাধ্যমে। Li-ion ব্যাটারী ইনস্টল করার নিয়ম নিম্নরূপঃ

ক। জিপিএস এর পিছন থেকে ব্যাটারীর ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে। ডি রিং ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরাতে হবে এবং ঢাকনাটি সাবধানে হালকাভাবে টানতে হবে।

খ। এরপর Li-ion ব্যাটারী প্রবেশ করাতে হবে এবং উপরের পদ্ধতির বিপরীত পথে ঢাকনাটি লাগাতে হবে।

গ। সতর্কতা: দীর্ঘ সময় জিপিএস ব্যবহার না করলে ব্যাটারীটি খুলে রাখতে হবে। উল্লেখ্য, ব্যাটারী খুলে ফেলার পরও সংরক্ষিত ওয়েপয়েন্ট, ট্রেইল, রুট ডাটা জিপিএস থেকে মুছে যাবে না।

৪। **নাভা জিপিএস চালু ও বন্ধ করার নিয়মঃ** জিপিএসটি চালু করার জন্য পাওয়ার বোতামটি ২ সেকেন্ড বা তার বেশি সময় ধরে চেপে রাখতে হবে। আবার চালু জিপিএসটি বন্ধ করার জন্য পাওয়ার বোতামটি ২ সেকেন্ড বা তার বেশি সময় ধরে চেপে রাখতে হবে।

৫। **স্যাটেলাইট সংকেত পাওয়ার উপায়ঃ** নাভা জিপিএস এর মাধ্যমে নিজের বর্তমান অবস্থান এবং পরিভ্রমন গুরুর আগে অবশ্যই জিপিএস অথবা GLONASS সংকেত পেতে হবে। স্যাটেলাইট সংকেত দ্রুত পাওয়ার জন্যঃ

ক। লম্বা গাছপালা ও বিল্ডিং থেকে দূরে বহিরাংগনে খোলামেলা জায়গায় যেতে হবে।

খ। এরপর নাভা জিপিএসটি চালু হলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যাটেলাইট সংকেত পাবে।

গ। জিপিএস অথবা GLONASS স্যাটেলাইট দেখার জন্য স্যাটেলাইট স্ট্যাটাস পেজ এ যেতে হবে।

৬। **জিপিএস Initialize করার কারণঃ** ০৩ টি কারণে GPS Initialize করতে হয়। যথাঃ

ক। প্রাথমিক ভাবে GPS সেট কেনার পর।

খ। GPS থেকে পূর্বের সব ডাটা মুছে গেলে।

গ। GPS বন্ধ অবস্থায় ৩০০ মাইলের বেশি রাস্তা অতিক্রম করলে।

৭। **সেনা সদস্যদের জন্য GPS এর প্রয়োজনীয়তা ঃ** বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি সেনা সদস্যদের GPS জানার প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। GPS এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা হয়ে থাকে।

ক। যে কোন অবস্থানের স্থানাংক নির্ণয় করা।

খ। যে কোন স্থান রেকী করার সময় ঐ স্থান মার্ক করা ও পুনরায় শুধুমাত্র জিপিএস এর সাহায্যে ঐ স্থানে গমন।

গ। যে কোন অবস্থানের স্থানাংক থাকলে ম্যাপের সাহায্য ছাড়াই ঐ স্থানে গমন।

ঘ। কয়েকটি Land Mark দিয়ে একটি রুট মার্চ চার্ট তৈরী করা যায়।

ঙ। গমন পথের Track Log তৈরী করা যায়।

৮। **নাভা এফ সিরিজ জিপিএস এর ৫ ধরনের পেজ আছেঃ** যথাঃ

ক। Satellite Status Page.

খ। Map page.

গ। Compass page.

ঘ। Main manu.

ঙ। Trip computer.

ক। **Satellite Status Page.**ঃ জিপিএস Status page এ বর্তমান অবস্থান, নির্ভুলতা, বর্তমান এলিভেশন, Satellite Location এবং Satellite Signal Strength দেখা যায়। স্যাটেলাইট স্ট্যাটাস পেজে স্যাটেলাইট সিগন্যাল Bar দ্বারা Satellite Strength কে নির্দেশ করে, যখন Bar গুলো সবুজ দেখায় তখন বোঝা যায় যে নাভা জিপিএস সঠিক স্যাটেলাইট সিগন্যাল পেয়েছে যা দ্বারা অবস্থান হিসেবে করা যায়।

খ। **Map Page.** ম্যাপ পেজে অবস্থান Markerএর সাহায্যে বর্তমান অবস্থান বোঝা যায়।

(১) **Changing Map Zoom Range.** ডিভাইসের পাশে যে Zoom In/Out বোতামটি আছে সেখানে চাপ দিতে হবে।

Reviewing Location on the Map.

(ক) যে অবস্থাটি পর্যালোচনা করতে চাই Rocker বোতামটি ব্যবহার করে Panning Pointer টি সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) Information Box Lattitute and Longitute Bearing and Distance দেখাবে।

(২) **Showing or Hide Data Field.**

(ক) ম্যাপ পেজে মেন্যু বোতামটিতে চাপ দিতে হবে।
(খ) ম্যাপ পেজের Submenu থেকে Hide data field, 2 data field অথবা 4 data field নির্বাচন করতে হবে।
(গ) Data field show or hide করার জন্য Enter বোতামটিতে চাপ নিতে হবে।

(৩) **Data Field Display পরিবর্তন.**

(ক) Menu বোতামটিতে চাপ দিতে হবে>Change Data Field।প্রথমে ডাটা ফিল্ডটি Highlight করতে হবে।
(খ) Data field page চালু করার জন্য Enter বোতামটিতে চাপ দিতে হবে।
(গ) Data field এর তালিকা হতে একটি অপশন নির্বাচন করতে হবে।

(৪) **Changing Map Orientation.**

(ক) On the Setting page, select map.
(খ) There are two map orientation
(গ) North up-orients the map like a papermap.
(ঘ) Track up- orients the map in the direction of travel.

(গ) **Compass Page.** : কম্পাস পেজ কম্পাস রিং এবং দিককোণ অথবা Course Pointer এর সাহায্যে পরিচালনা করে। ঘূর্নায়মান কম্পাস রিং যেদিকে যেতে চাই ঐ সেদিকে নির্দেশ করে। দিককোণ এবং Course Pointer গন্তব্যস্থানের দিক নির্ণয় করে। কম্পাসটি GPS/GLONASS ডাটা দ্বারা পরিচালিত হয়।

(ঘ) **Trip Computer Page.:** Trip Computer page ছোট font size এর আট ধরনের নেভিগেশন ডাটা দেখা যায় অথবা বড় font size এর তিন ধরনের Data field দেখা যায়। প্রত্যেকটি Data field নির্ধারিত এবং প্রত্যেকটি ফিল্ড অনেকগুলো নেভিগেশন ডাটা ধারন করতে পারে। যখন Data field নির্ধারিত হয়ে যায় তখন Enter বোতামটিতে চাপ দিতে হবে। যখন তুমি নতুন Trip শুরু করার জন্য প্রস্তুত হবে তখন Submanu তোমাকে Trip Computer data reset করতে বলবে ছোট অথবা বড় font size বেচে নিতে হবে এবং Restart করতে হবে।

(ঙ) **Main Menu Page.**: Main Menu তে Setting and feature থাকে যা Main Menu page এবং Submenu তে দেখা যায় না।Menu বোতামটি চাপ দেওয়ার মাধ্যমে যে কোন পেজ থেকে Main Menuতে পাওয়া যায়।Main Menu থেকে কোন ITEM নির্বাচন করতে হলে Menu ITEM হাইলাইট করতে হবে এবং Enter বোতামটিতে চাপ দিতে হবে।

৯। **Coordinate System Setting/Initialization:** এই অনুচ্ছেদটি অবশ্যই দৃষ্টিপাতযোগ্য একটি বিষয়। এই সেটিং মূলত কাগজে ম্যাপে কিভাবে একটি স্থানাংক নির্ণয় হয় তার বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।এটি মূলত পৃথিবীর স্বীকৃত বিভিন্ন প্রজেকশন সিস্টেমেরই বহিঃপ্রকাশ করে থাকে। পৃথিবীতে অনেক প্রকার প্রজেকশন সিস্টেম রয়েছে যেমন UTM (Universal Transverse Marcatos), WGS, LCC (Lambert Conical Conformal) ইত্যাদি। পূর্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে Yard Map ব্যবহার করা হয়েছিলো তা LCC এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত হতো। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মিটার ম্যাপ ব্যবহার করা হয়, যা UTM উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট Datum Point কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। প্রতিটি প্রজেকশন সিষ্টেম কিছু ধ্রুব তথ্য সন্নিবেশ করতে হয়। যেহেতু অন্যান্য প্রজেকশন সিষ্টেম আমাদের প্রয়োজন নাই সেহেতু এখানে কেবলমাত্র BUTM প্রজেকশন সিস্টেম এর প্রয়োজনীয় ডাটা Setup দেয়া হলোঃ

(GPS NAVA F-30 ইনেশিয়ালাইজ)

Menu ⟶ Main Menu ⟶ Setting ⟶ Unit

(a) Map Datum ⟶ User ⟶ User
DX= +283.70
DY= +735.90
DZ= +2016.10
DA= -880.655
DF= +0.28361368 (Exit all)

(b) Position FormetUser → Tm → User Tm
Central meridian E = 90.00000
Projection Scale (+) = 0.998796
False East (+) = 03000100.00
False North (+) = 01003100.00 (Exit all)

(c) Area = Sq km
(d) Angel = Degree
(e) Distance = Km/m
(f) Speed = Km/m

নোট-১ঃ GLONASS Means Global Navigation Satellite System রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক রেডিও নেভিগেশন সিস্টেম এর উপর ভিত্তি করে এ স্যাটেলাইট টি পরিচালিত।

প্রতিরক্ষায় দূরত্ব নির্ণয় ও নকশা অংকন

১। **ভূমিকাঃ** আমরা সেনাবাহিনীর সদস্য, সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চলাচল বা অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। সৈন্যদলের কোন অংশকে যখন যুদ্ধক্ষেত্র বা অন্য কোন স্থানে আত্নরক্ষার্থে বা অন্য কোন কারনে অবস্থান করতে হয় তখন যে কোন আক্রমনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হয়। নিজেদেরকে তথা দেশের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ডিফেন্স বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। শত্রুর আক্রমনকে প্রতিহত করতে হয়। শত্রুকে প্রতিহত করতে না পারলে উক্ত সেনাদলের তথা সহকারী সেনাদলের জীবন বিপন্ন হয়। দেশের সার্বভৌমত্ব হয় হুমকির সম্মুখীন। তাই শত্রুর আক্রমনকে সাফল্যের সাথে প্রতিহত তথা শত্রুকে ধ্বংস করতে শক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। আর এ প্রতিরোধকে বহুলাংশে সাহায্য দুরত্ব মাপক কার্ড। সাধারনতঃ প্লাটুন বা ইহার সমকক্ষ সৈন্য দলের নায়ককে উক্ত নকশা প্রস্তুত করতে হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক নকশা তৈরী করলে গুলি করার আদেশ ইত্যাদিতে অনেক সুবিধা হয়।

২। **প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক কার্ডঃ** কোন সৈন্যদল বা এর কোন অংশের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত রণকৌশলগত প্রধান বস্তু বা ফিচার সমূহের অবস্থান ও দূরত্ব কোন কার্ড কাগজে প্রদর্শিত হলে উক্ত কার্ডকে প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক কার্ড বলা হয়।

৩। **প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক কার্ডের প্রয়োজনীয়তা।**

ক। নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রতিরক্ষা দূরত্ব পরিমাপক কার্ড প্রস্তুত করলে এর সাহায্যে প্লাটুন বা সেকশন কমান্ডার তথা যে কোন স্তরের কমান্ডারই শত্রুকে দেখা মাত্র গুলি করার আদেশ করতে পারেন।

খ। কোন টার্গেট তথা শত্রুর সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

গ। কমান্ডার সহজেই অধিনস্থ সৈনিককে শত্রুর অবস্থান দেখাতে পারেন।

ঘ। উক্ত অঞ্চলে কার্যরত পরবর্তী কোন সেনাদল পূর্ববর্তী দলের প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক কার্ড দেখে অতি অল্প সময়ে এলাকা সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারে এবং রণকৌশলগত বস্তু সমূহকে চিহ্নিত করতে এর দূরত্ব জানতে হবে

৪। **প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক কার্ড প্রস্তুত প্রণালীঃ** একটি আদর্শ প্রতিরক্ষা দূরত্ব পরিমাপক কার্ড প্রস্তুত করতে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে হয়।

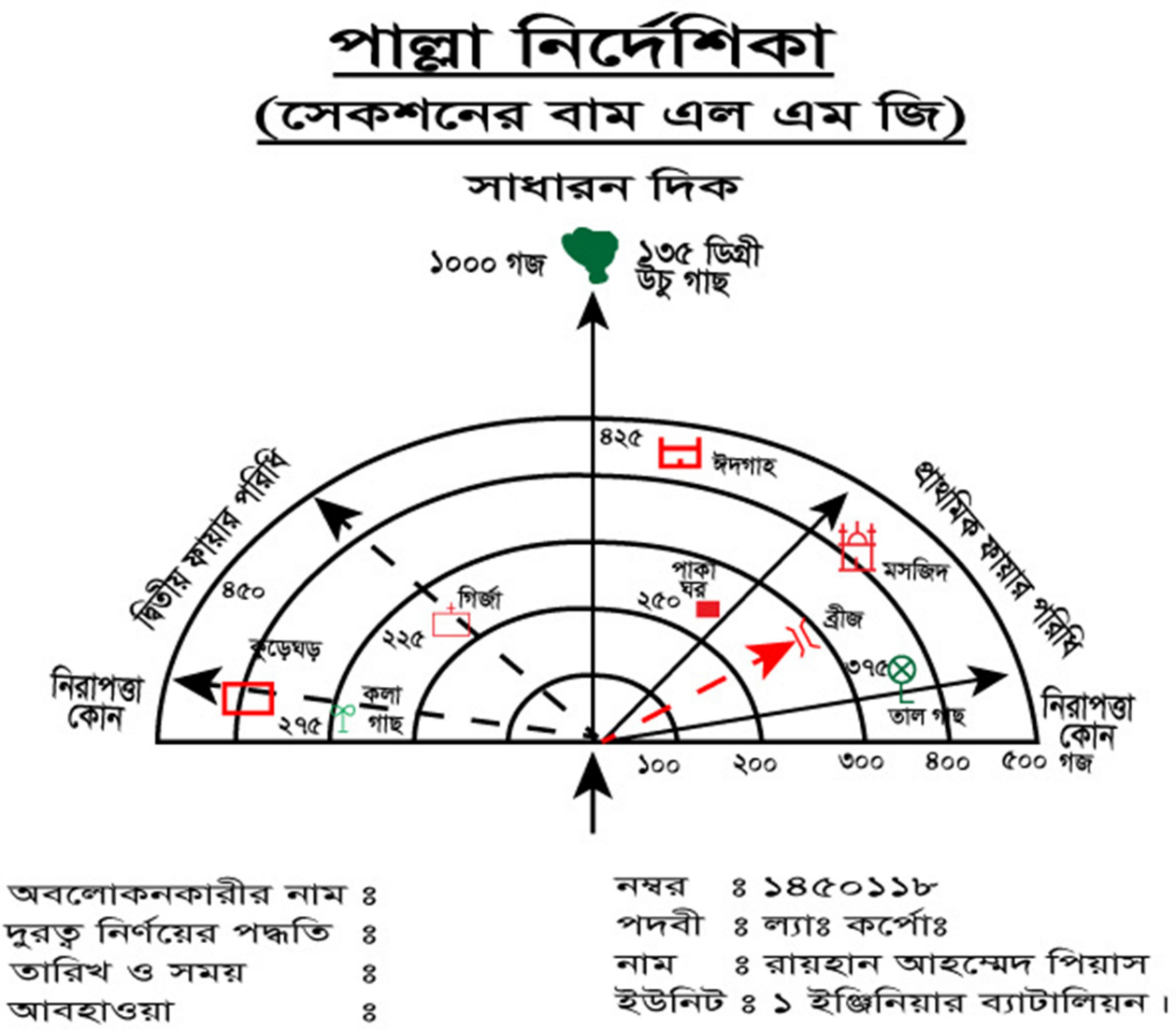

চিত্রঃ প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক কার্ড

ক। প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক নকশা প্রস্তুত করার জন্য নির্দিষ্ট কাগজের নিম্নাংশ সামান্য স্থান ছেড়ে দিয়ে ভিত্তি রেখা অংকন করতে হবে। নিজ অবস্থান হতে সম্পূর্ণ ডান ও সম্পূর্ণ বাম বরাবর কল্পিত সরল রেখাকে ভিত্তি রেখা বলে।

খ। ওপি বা পর্যবেক্ষকের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে হয়। ইহা মোটামুটি ভাবে ভিত্তি রেখা এর মাঝামাঝি হবে এবং ভিত্তি রেখাকে ওপি এর উভয় দিকে ১৮০০ তে যেন শত্রুর অবস্থানকৃত ভিত্তি রেখার মোটামুটি সমান্তরাল হয়।

গ। ওপিকে কেন্দ্র করে ভিত্তি রেখার সম্মুখ দিকে কয়েকটি অর্ধবৃত্ত অংকন করতে হবে। অর্ধবৃত্তের একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব সমান হবে। ধরা যাক উহা ২৫০ গজ হবে, এভাবে পুরো দায়িত্বপূর্ণ এলাকাটি এ অর্ধবৃত্তগুলো দিয়ে কভার করতে হবে। ভিত্তি রেখার ডান দিকের শুরুর স্থান দূরত্ব নির্দেশ করবে।

ঘ। ওপি ১০০০ হতে ১৫০০ গজ দূরত্বের মধ্যে ঠিক সম্মুখের দিক অর্থাৎ ওপি হতে ঘরির কাটার ১২টা বাজে এমন দিকে একটি রেফারেন্স পয়েন্ট নির্বাচন করতে হবে। ঐ দিককে এক্ষেত্রে ধ্রুব দিককোণ বলা হয়ে থাকে। বস্তুর বাম পাশে এর নাম লিখতে হবে। বস্তুর বাম পাশে ওপি হতে এর দূরত্ব লিখতে হবে এবং সাংকেতিক চিহ্নের উপরে এর ধ্রুব দিককোণ লিখতে হবে।

ঙ। রেফারেন্স পয়েন্টের চিহ্ন ও ওপিকে সংযুক্ত করতে হবে। আর এর ফলে যে লাইন বা রেখা সৃষ্টি হবে ইহাকে নির্দেশক রেখা বলা হয় এবং কার্ডে অংকিত অন্যান্য রেখার চেয়ে ইহা মোটা বা স্থুল হবে।

চ। জিরো রেখার উভয় পার্শ্বে নির্বাচিত অন্যান্য বস্তুকে ওপি হতে তাদের যথাযথ স্থানে প্লট করতে হবে এবং সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

(১) ডান দিকে বস্তুর নাম ও বাম দিকে বস্তুর দূরত্ব লিখতে হবে।
রেফারেন্স পয়েন্ট হতে প্রত্যেকটি বস্তুর ডিগ্রীর পরিমান নির্ণয় করে তা সংশ্লিষ্ট রেখার মাঝামাঝি লিখতে হবে।
(২) নির্দেশক রেখার উভয় পাশে বস্তুর সংখ্যা ২টির কম ও ৩টির বেশী হবে না।
কোন বস্তু কার্ডে অংকিত অর্ধবৃত্তের উভয় পাশে ইহার দূরত্ব লেখার শিরোনাম সমূহ নির্ণয় করা যায়।

ভূমির উপর কোন বস্তু বা স্থান হতে স্বীয় অবস্থানে অন্যকোন স্থান বা বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন কোণের পরিমান আনুমানিক ভাবে পরিমাপ করা যায়। নিজের সম্মুখে বাহুকে সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করে দেখানো হাতের বিভিন্ন কোণের পরিমান আনুমানিক ভাবে নির্ণয় করা যায়।

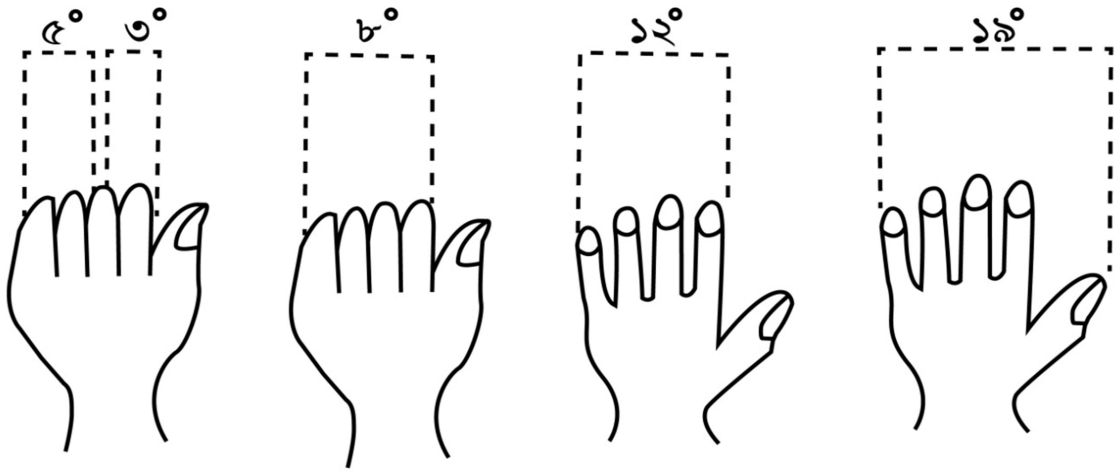

৫। **চতুর্মুখী প্রতিরক্ষাঃ** অবস্থানের চতুর্দিকের প্রতিরক্ষা দূরত্ব মাপক রেখার উর্ধ্বে ও নিম্নে সম্পূর্ণ নকশা প্রস্তুত করতে হবে। ইহা ব্যতীত অর্ধবৃত্তাকৃতির দুটি পৃথক পৃথক প্রতিরক্ষা দূরত্বমাপক নকশা প্রস্তুত করেও কার্য সম্পাদন করা যায়। স্মরন রাখতে হবে যে, প্রতিরক্ষা দূরত্বমাপক নকশা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও নির্ভূল সাংকেতিক চিহ্নাদি ব্যবহার করে প্রস্তুত করতে হবে। যতটুকু সম্ভব, দূরত্ব ও কোণের পরিমাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করে লিখতে হবে।

৬। **উপসংহারঃ** সুতরাং উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রতিরক্ষার দূরত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইহা সম্পর্কে জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র

১। **ভূমিকাঃ** প্রাচীন কাল থেকেই সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তা ছাড়া দিক নির্ণয়ের কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে একমাত্র কম্পাসের সাহায্যেই দিক নির্ণয় করা যায়। কম্পাস ঘড়ির মত গোল বা অন্য আকৃতির হতে পারে। কম্পাস যে আকৃতিরই হউক না কেন এদের মৌলিক গঠন প্রত্যেকটির একই। আকৃতির ভিন্নতার জন্য শুধুমাত্র ব্যবহারের বেলায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য রয়েছে। কম্পাসে মূলতঃ চুম্বক শলাকাকে মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করতে দেয়া যায়, যা সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে। এর উপর ভিত্তি করে প্রথমে প্রধান দিকসমূহ এবং পরবর্তীতে দুই দিকের মধ্যবর্তী অংশকে ডিগ্রীতে বিভক্ত করা হয়।

২। **প্রিজমেটিক কম্পাসঃ** এ ধরনের কম্পাসের আকৃতি গোল। কম্পাস এমন এক প্রকার ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত যা চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ চুম্বকের ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে। এতে বহুলাংশে পিতল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কম্পাস প্রস্তুতিতে কাঁচ, রাবার, তৈল জাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে চিত্রে এর প্রত্যেক অংশকে ক্রমিক নম্বর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। অংশগুলির বিবরণ চিত্র-৪-১(ক) ও ৪-১(খ) পৃষ্ঠা ৪-২ ও ৪-৩ এ প্রদত্ত হলোঃ

ক। খাঁজ - ঢাকনি হতে বর্ধিত অংশের কর্তিত স্থান।
খ। জিব - ঢাকনির বর্ধিত অংশ।
গ। জানালা - ঢাকনির কাঁচ।
ঘ। সূক্ষ্ম রেখা - জানালায় কাল সূক্ষ্ম রেখা।
ঙ। উজ্জ্বল রেখা - ঢাকনির উভয় পার্শ্বে রেডিয়ামযুক্ত দুইটি স্থান।
চ। কব্জা - এর সাহায্যে ঢাকনি কম্পাসের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।
ছ। ঢাকনি - ইহা কম্পাসকে ঢেকে রাখে।
জ। বাক্স - এর ভিতরে ডায়্যাল, তৈল ইত্যাদি আছে।
ঝ। আবরণী কাঁচ - একে ঢিলা করে ঘুরানো যায়।
ঞ। দিকচিহ্ন - আবরণী কাচের উপরস্থ রেডিয়ামমুক্ত স্থান।
ট। লাবার লাইন - আবরণী কাঁচের নীচে কব্জার দিকে সূক্ষ্ম কাল রেখা।
ঠ। ডায়্যাল - এর উপর তীরচুম্বক ও দুই সারিতে ডিগ্রী লেখা রয়েছে।
ড। কীলক বা পিভট - এর উপর ডায়্যাল বসানো আছে।
ঢ। চৌম্বক তীর - ইহা সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে।
ণ। সেটিং ভেন - আবরণী কাঁচ সংলগ্ন ধাতব চতুর্দিকে কর্তিত স্থান।
ত। আটিবার স্ক্রু - আবরণী কাঁচকে ঢিলা বা শক্ত করার স্ক্রু।
থ। বিবর্ধন কাচ - ইহা প্রিজমের ন্যায় ত্রিকোণাকার কাঁচ এবং কোন বস্তুকে, বিশেষতঃ ডায়্যালস্থ ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা প্রিজম ডিগ্রীকে আপাতঃ দৃষ্টিতে বর্ধিত করে দেখায়।
দ। প্রিজম হোল - প্রিজমের আবরণে একটি ছিদ্র, যার সাহায্যে ডায়্যালস্থ ডিগ্রী সঠিকভাবে পড়া যায়।
ধ। লক্ষ্য করার ছিদ্রপথ - প্রিজমের আবরণের উপরস্থ কর্তিত অংশ, যার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বস্তুর উপরে লক্ষ্য নিতে হয়।
ন। আংটি বা রিং - এর সাহায্যে কম্পাসকে শক্তভাবে ধরা যায়।
প। খাঁজ - আংটির কর্তিত অংশ।

সে সমস্ত কম্পাসের ভিতর তৈল থাকে, এদের ডায়্যাল দ্রুত স্থির হয়ে যায়। যে সমস্ত কম্পাসের ভিতর তৈল থাকে না, এদের ডায়্যালকে চেক-স্প্রিংয়ের সাহায্যে স্থির করাতে হয়।

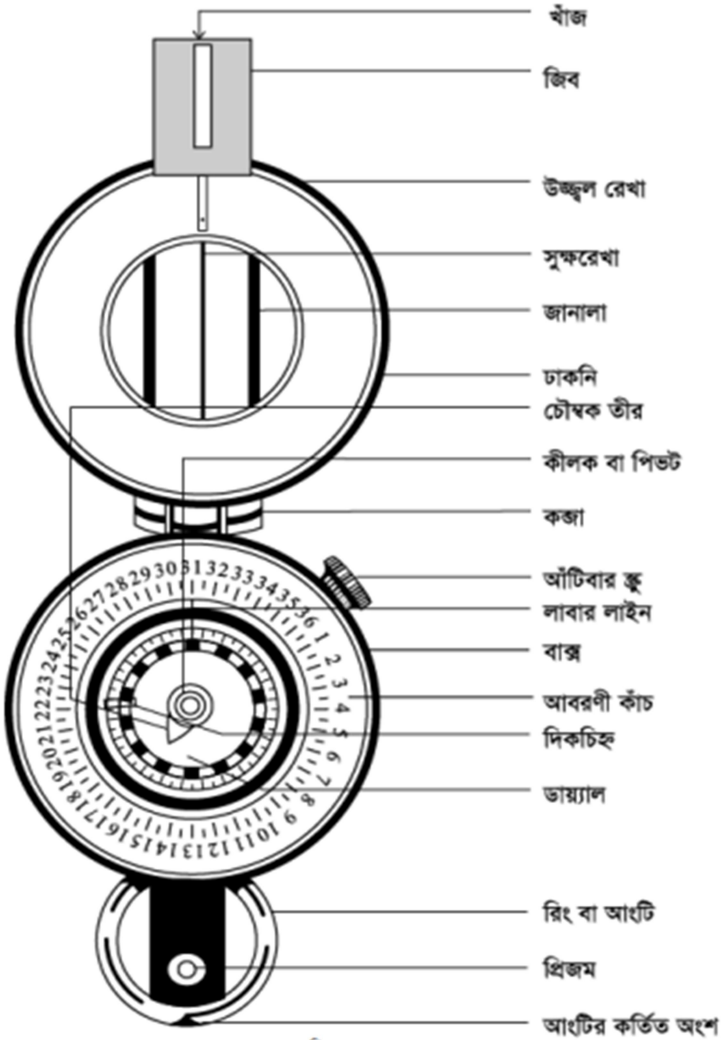

চিত্রঃ প্রিজমেটিক কম্পাস

৩। **<u>কম্পাসকে ধরার নিয়মঃ</u>** কম্পাস ব্যবহারের সময় একে এমন ভাবে ধরতে হবে যেন সহজে এবং আরামদায়ক অবস্থায় সঠিক পাঠ নেয়া যায়। যেহেতু প্রিজমেটিক কম্পাসের ধরার আংটি সামনে তাই ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীকে কম্পাসের আংটির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে তর্জনীয় সাহায্যে কম্পাসের বাক্সটিকে চেপে ধরতে হবে। যাতে কম্পাসটি সুন্দর ভাবে হাতের উপর স্থাপিত হয় সেজন্য বাকী আঙ্গুলগুলোকে গোল করে কম্পাসের নীচে রাখতে হবে। তাহলে কম্পাস দৃঢ়ভাবে হাতের উপর বসে থাকবে। বামহাতে এর ঢাকনিটি উঠিয়ে কম্পাসের বাক্সটির সাথে সমকোণীভাবে রেখে দিতে হবে। প্রিজম আবরণকে উঠিয়ে আবরণী কাচের উপর বসাতে হবে। অতঃপর কম্পাসকে উঠিয়ে ডান চোখের সম্মুখে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন, লক্ষ্য করার ছিদ্র পথ দিয়ে লক্ষ্যবস্তু ভালভাবে চেপে ধরতে হবে, যেন সহজে নড়তে না পারে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে কম্পাসটি যেন সর্বদা একই লেভেলে অর্থাৎ ভূমির সমান্তরাল থাকে।

৪। **দিককোণ পঠনঃ** কোন লক্ষবস্তুর কম্পাস দিককোণ পড়তে হলে কম্পাস সহ লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রথমে কম্পাসের লক্ষ্য করার ছিদ্রপথ ও জিবের সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুটির সাথে কাল্পনিক রেখা সৃষ্টি করতে হবে। অতঃপর ঢাকনির উপরস্থ সূক্ষ্ম রেখাটিকে লক্ষ্যবস্তুর সাথে সঠিকভাবে একই লাইনে মিলাতে হবে। যেমনটি একজন ফায়ারার রাইফেলের ব্যাক সাইড ইউ, ফ্রন্ট সাইট টিপ এবং লক্ষ্যবস্তুর লক্ষ্যবিন্দু একই লাইনে আসার পর ফায়ার করে থাকে। তেমনই কম্পাস দিককোণ পঠনের বেলায় কম্পাসের লক্ষ্য করার ছিদ্রপথ, সূক্ষ্ম রেখা এবং লক্ষ্যবস্তু একই কাল্পনিক লাইন সৃষ্টির পর দিককোণ পাঠ করতে হবে। এ অবস্থায় কম্পাসের প্রিজম হোলের ভিতর লক্ষ্য করলে দুই সারিতে ডিগ্রী দেখা যাবে, যা উপরের সারিতে সোজা ও নিম্নের সারিতে উল্টাভাবে লেখা। কম্পাস দিককোণ পড়ার জন সোজা লেখা ডিগ্রীগুলো পড়তে হবে। সংখ্যাগুলো স্পষ্ট অথবা পরিষ্কার ভাবে পড়তে না পারলে প্রিজম কভারকে সামান্য উপরে বা নীচে করলেই এ অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।

৫। **লেন্সেটিক কম্পাসঃ** এ ধরনের কম্পাসের আকৃতি প্রায় চতুষ্কোণাকার। কম্পাস এর দুই পাশে ধাতব পাতের উপর প্রস্তুত সেঃ মিঃ এবং ইঞ্চির দুটি স্কেল সংযুক্ত রয়েছে যা দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ব্যবহার করা যায়। ঢাকনির নীচে কম্পাস বাক্সের ডান কোণায় একটি লেভেলার স্থাপিত আছে। ফলে দিককোণ পঠনের সময় কম্পাসটি ভূমির সমান্তরাল অর্থাৎ হাতের উপর সঠিক ভাবে স্থাপিত আছে কিনা তা পরীক্ষা করা যায়। এ কম্পাসে প্রিজমের পরিবর্তে লেন্স হোলের ভিতরের দিকে একটি ছোট লেন্স খাড়া ভাবে স্থাপিত আছে। প্রিজমেটিক কম্পাসের মত এ কম্পাসও এক প্রকার বিশেষ ধাতব পদার্থের তৈরী যা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। বর্তমানে সেনাবাহিনীতে এ ধরনের কম্পাসই বেশী ব্যবহৃত হয়। অংশগুলো চিত্র ৪-৪ এ প্রদত্ত হলো এবং অংশগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক। জিব - ঢাকনির বর্ধিত অংশ।
খ। ঢাকনি - ইহা কম্পাসকে ঢেকে রাখে।
গ। জানালা - ঢাকনির কাঁচ।
ঘ। সাপোর্টিং রড - ঢাকনির কাঁচকে ভাংগা থেকে রক্ষা করে।
ঙ। সূক্ষ্ম রেখা - জানালায় কাল সূক্ষ্ম রেখা।
চ। কব্জা - এর সাহায্যে ঢাকনি কম্পাসের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।
ছ। রিং - এর সাহায্যে কম্পাসকে শক্তভাবে ধরা যায়।
জ। লাবার লাইন - আবরণী কাচের নীচে কব্জার দিকে সূক্ষ্ম কাল রেখা।
ঝ। সেটিং ভেন - আবরণী কাঁচ সংলগ্ন ধাতুর চতুর্দিকে কর্তিত স্থান।
ঞ। দিকচিহ্ন - আবরণী কাঁচের উপরস্থ রেডিয়ামযুক্ত স্থান।
ট। তীর চৌম্বক - ইহা সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে।
ঠ। বাক্স - এর ভিতরে ডায়্যাল, তৈল ইত্যাদি আছে।
ড। লেভেলার - ইহা কম্পাসকে সমতল রাখতে সাহায্য করে।
ঢ। লেন্স হোল - এর সাহায্যে ডায়্যালের ডিগ্রী সঠিকভাবে পড়া যায়।
ণ। কীলক বা পিভট - এর উপর ডায়্যাল স্থাপিত আছে।
ত। ডায়্যাল - এর উপর তীর চুম্বক ও দুই সারিতে ডিগ্রী লেখা রয়েছে।
থ। পার্শ্ব স্কেল - মাপনীর কাজে একে ব্যবহার করা হয়।
দ। খাঁজ - লেন্স হোলের উপরস্থ বর্ধিত অংশের কর্তিত স্থান।

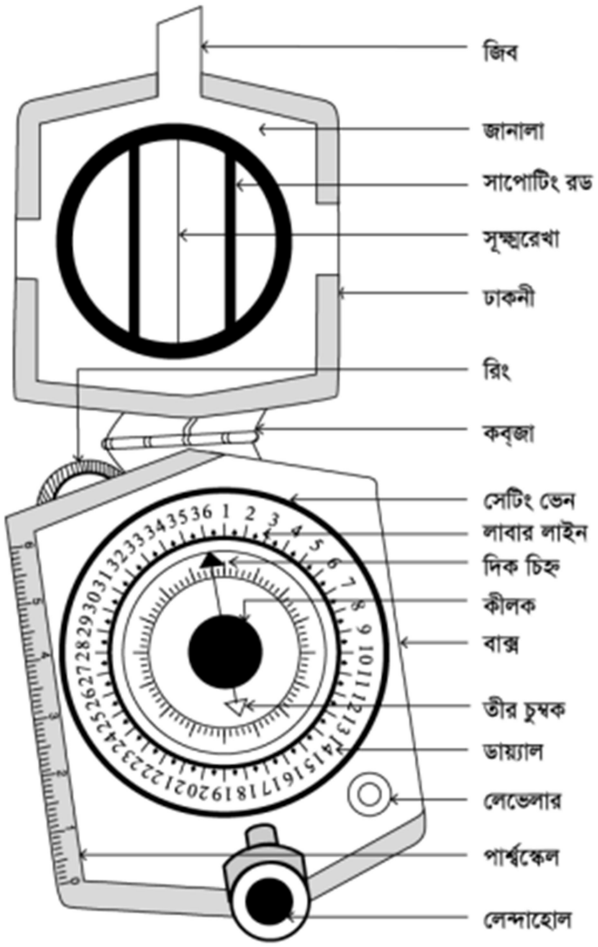

চিত্রঃ লেন্সেটিক কম্পাস।

৬। **কম্পাসকে ধরার নিয়মঃ** কম্পাস ধরার নিয়ম উভয় ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের। পার্থক্য শুধুমাত্র ধরার আংটি টি লেন্সেটিক কম্পাসের বেলায় কম্পাস বাক্সের পিছনের দিকে এবং প্রিজমেটিক কম্পাসের বেলায় সামনের দিকে। সুতরাং লেন্সেটিক কম্পাসকে ধরার জন্য ডান হাতের তর্জনী বা শাহাদত আঙ্গুলকে কম্পাসের আংটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুলের সাহায্যে কম্পাসের বাক্সটিকে চেপে ধরতে হবে। বাকী আঙ্গুলগুলোকে গোল করে কম্পাসের নীচে রাখতে হবে। তাহলে কম্পাস দৃঢ়ভাবে হাতের উপর বসে থাকবে। বাম হাতের সাহায্যে এর ঢাকনী উঠিয়ে কম্পাসের বাক্সের সমকোণীভাবে রাখতে হবে। অতঃপর কম্পাসকে উঠিয়ে ডান চোখের সম্মুকে এমনভাবে ধরতে হবে যেন লক্ষ্যবস্তু ভালভাবে দেখা যায়। কম্পাসসহ হাতকে গালের সাথে ভালভাবে চেপে ধরতে হবে যেন তা সহজে নড়তে না পারে। প্রয়োজনে এ কম্পাসকে পিছনে প্যাচকাটা ছিদ্রের সাহায্যে স্ট্যান্ডের উপর স্থিরভাবে বসিয়ে রাখা যায়।

৭। **কম্পাসে দিককোণ স্থাপন করাঃ** রাতে কম্পাস ব্যবহার করতে হলে অন্ধকারে ইহা দ্বারা কম্পাস দিককোণ পড়া যায় না। এজন্য দিনের বেলায় এর দিককোণ স্থাপন করে একে ব্যবহার করতে হবে। দিককোণ পরিবর্তনের সময় ডায়্যাল একটু চেপে ডানে বা বামে ঘুরে প্রয়োজনীয় ডিগ্রীতে সহজে বসানো যায়। ডায়্যালের উপর ১ হতে ৩৬ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা আছে। প্রতি সংখ্যার ডানে শূন্য বসালে ঐ দাগের সঠিক ডিগ্রী পাওয়া যায়। যেমন ২৫ সংখ্যাটিতে ২৫০ ডিগ্রী, ৩১ সংখ্যাটিতে ৩১০ ডিগ্রী ইত্যাদি। আবার প্রত্যেক দুই রাশির মধ্যে একটি বিন্দু রয়েছে। এতে ০৫ ডিগ্রী বুঝায়। যেমন ১৬ ও ১৭ সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে যে বিন্দু রয়েছে ইহাতে ১৬৫ ডিগ্রী হবে। কম্পাসে যত ডিগ্রী স্থাপন করতে হবে, ডায়্যালের উপরে লেখা উক্ত সংখ্যাটি লাবার লাইনের বরাবর রাখতে হবে।

৮। **সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিককোণঃ** কম্পাসের সাহায্যে আমরা কোন বস্তুর যে কম্পাস দিককোণ পড়ি, অর্থ্যাৎ স্বীয় অবস্থান হতে নির্দিষ্ট বস্তুর যে কম্পাস দিককোণ হয়, একে সম্মুখ দিককোণ বলে। আর নির্দিষ্ট বস্তু হতে স্বীয় অবস্থানের যে দিককোণ হয় একে পশ্চাৎ দিককোণ বলে। যেমন স্বীয় অবস্থান হতে আমরা কোন বস্তুর দিককোণ ২৭০ ডিগ্রী পড়লাম। ইহা সম্মুখ দিককোণ। উক্ত বস্তু হতে আমাদের অবস্থানের দিককোণ ৯০ ডিগ্রী, ইহা ঐ বস্তুর পশ্চাৎ দিককোণ। সম্মুখ দিককোণ ১৮০ ডিগ্রী হতে কম হলে এর সাথে ১৮০ ডিগ্রী যোগ করলেই পশ্চাৎ দিককোণ পাওয়া যাবে। আর ১৮০ ডিগ্রী হতে বেশি হলে উক্ত দিককোণ হতে ১৮০ ডিগ্রী বিয়োগ করলেই পশ্চাৎ দিককোণ জানা যাবে। কম্পাসের লেন্স হোল দিয়ে ডিগ্রী পড়ার সময় যে উল্টা সংখ্যা দেখা যায়, ইহা পশ্চাৎ দিককোণ নির্দেশ করে। পশ্চাৎ দিককোণ জানা থাকলে উপরোক্ত নিয়মে সম্মুখ দিককোণ জানা যায়।

৯। **কম্পাসের ত্রুটিঃ** কোন নির্দিষ্ট বস্তুর কম্পাস দিককোণ পঠনকালে কোন কম্পাস যদি সঠিক কম্পাস দিককোণ নির্দেশ না করে তাহলে বলা যায় কম্পাসটি ত্রুটিপূর্ণ। কম্পাসের এ ত্রুটি দুটি কারনে হতে পারে। এর একটি হলো কম্পাসের যান্ত্রিক বা ব্যক্তিগত ত্রুটি এবং অপরটি হলো কম্পাসের উপর অন্য কোন বস্তুর প্রভাব। নিম্নে কম্পাসের ত্রুটির বিশদ বিবরণ ও দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করা হলোঃ

ক। **কম্পাসের ব্যক্তিগত ত্রুটিঃ**

কম্পাসের কোন অংশ ভাঙ্গা বা বিকল থাকা। এ ধরণের ত্রুটি দূরীকরণের জন্য একে ওয়ার্কশপে পাঠাতে হবে।

১) কোন কম্পাস দ্বারা পঠিত কম্পাস দিককোণ চৌম্বক দিককোণ অপেক্ষা সর্বদা নির্দিষ্ট পরিমাণে কম বা বেশী হলে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ কম বা বেশী দিককোণ পঠিত দিককোণের সাথে যোগ বা বিয়োগ করে প্রকৃত দিককোণ বের করতে হবে। কম্পাসের এ ধরণের ব্যক্তিগত ত্রুটি কম্পাসের সুবিধামত স্থানে লিখে রাখতে হবে। তবে কম্পাসের এ ধরনের ব্যক্তিগত ত্রুটি নিরূপণে কোন নির্দিষ্ট অবস্থানে কোন বস্তুর গ্রীড দিককোণ হতে পরিবর্তিত চৌম্বক দিককোণ বের করে নিতে হবে। এ কাজে ১ঃ২৫০০০ মাপনীর ম্যাপ ব্যবহার সুবিধাজনক। আবার একাধিক আদর্শ কম্পাস ব্যবহার করেও নতুন যে কোন কম্পাস এদের সাথে তুলনা করে নতুন কম্পাসটির ব্যক্তিগত ত্রুটি নিরূপণ করা যায়।

১)অনেক সময় ডায়্যাল কীলকের উপর সঠিকভাবে না বসে অন্যভাবে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় কোন চৌম্বক বা চৌম্বকধর্মী লৌহখন্ড কম্পাসের পার্শ্বে এনে ধরলেই বা একটি ঝাঁকুনী দিলেই ইহা সঠিকভাবে কীলকের উপর বসে থাকবে। যে সমস্ত কম্পাসের ভিতর তরল পদার্থ থাকে এদের দ্বারা কম্পাস দিককোণ পাঠের সময় যদি বুদবুদের উপস্থিতি এতে বিঘ্ন ঘটায় তবে এদেরকে একটু ভালভাবে নেড়ে বা ঝাঁকুনি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

খ। কম্পাসের উপর অন্য বস্তুর প্রভাব বা আকর্ষণ/বিকর্ষণ জনিত ত্রুটি। ভূমিতে অবস্থিত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ধাতব পদার্থ কম্পাসের তীর চৌম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হলে বা বিকর্ষিত হলে ঐ কম্পাসটি ঐ নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক কম্পাস দিককোণ বা দিক নির্দেশ করবে না কম্পাসের এই ত্রুটিকে আমরা এর উপর অন্যবস্তুর প্রভাবজনিত ত্রুটি বলে থাকি। এ ধরণের ত্রুটি নিরূপণ এবং দূরীকরণের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

গ) দৃষ্ট কোন ধাতব বস্তু দ্বারা ব্যবহৃত কম্পাস আকৃষ্ট হলে সে আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কম্পাস ব্যবহারকারীকে কম্পাসটিকে হাতে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে।

১) কোন কম্পাস ব্যবহারকারী দ্বারা তার নিজ অবস্থান হতে বেশ দূরের কোন বস্তু বা স্থানের পঠিত দিককোণ এবং নিজ অবস্থান হতে একটু এদিক ওদিক সরে পঠিত পার্থক্য হবে না। যদি তেমন পার্থক্য হয় তবে মনে করতে হবে যে, ভূ-গর্ভের কোন অদৃশ্য ধাতু কম্পাস দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে।

সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর ও রোমার

১। **ভূমিকাঃ** যে উপকরণ বা বস্তুও সাহায্যে ম্যাপের উপর দিককোণ পঠন ও স্থাপন করা যায় তাকে সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর বলে। দিককোণ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই অনেক কিছু শিখেছি। ম্যাপের উপর কোনও অবস্থান হতে অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের দিককোণ জানতে সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর ব্যবহার করতে হয়। সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর তিন প্রকারের। যথা-গোলাকার, অর্ধগোলাকার এবং চতুষ্কোণাকার। ম্যাপের ব্যবহারিক কাজে তিন প্রকারের সার্ভিস প্রট্র্যাক্টরই ব্যবহার করা যায়। সামরিক কার্যকলাপে চতুষ্কোণাকার সার্ভিস প্রট্র্যাক্টরই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ এতে ডিগ্রী ব্যতীত নানা প্রকারের মাপনীও অঙ্কিত থাকে। ইহা হস্তীদন্ত, ধাতু, কাঠ, সেলোলয়েড বা শক্ত কাগজে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর সাধারণতঃ ৫ ইঞ্চি এবং ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ২ ইঞ্চি চওড়া হয়। মার্ক থ্রী ও মার্ক ফোর দু প্রকারের সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর পাওয়া যায়। মার্ক ফোর সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর মধ্যখানটা কাটা থাকে। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। ছবিতে এর দুটি দিকই দেখানো হয়েছে।

একদিকের এক প্রান্তে দুই সারিতে ডিগ্রী আঁকা আছে ও অন্য প্রান্তের মধ্যখানে তীর চিহ্ন আছে। অপর দিকে নান প্রকারের মাপনী অঙ্কিত আছে।

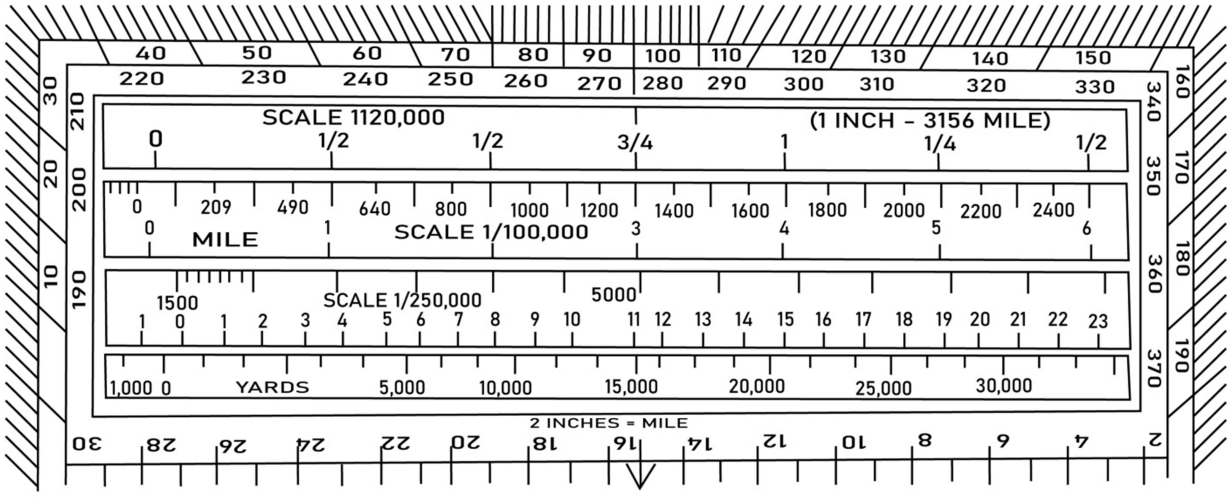

চিত্রঃ সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর

২। **ব্যবহারঃ** ম্যাপে সার্ভিস প্রট্রাক্টর ব্যবহার করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইহা যেন গ্রিড লাইনের সাথে সমান্তরাল থাকে।

ক। দিককোণ স্থাপনঃ দিককোণ ১৮০ ডিগ্রী হতে কম হলে একে অবস্থানের ডানদিকে এবং বেশী হলে বামদিকে রাখতে হবে। তীরের অগ্রভাগ অবস্থানের উপর রেখে একে গ্রিড লাইনের সাথে সমান্তরাল করতঃ ম্যাপের উপর রাখতে হবে। নির্দিষ্ট দিককোণ সোজা ম্যাপে একটি বিন্দু লাগিয়ে সার্ভিস প্রট্র্যাক্টরটি সরিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর নির্দিষ্ট অবস্থান এবং উক্ত বিন্দুকে এক সরল রেখায় মিলিয়ে দিলেই নির্দিষ্ট দিককোণ স্থাপন হয়ে যাবে। প্রয়োজন বোদে উক্ত রেখাটিকে সামনে বর্ধিত করা যায়।

খ। গ্রিড দিককোণ পঠনঃ ম্যাপের উপরস্থ কোন অবস্থান হতে অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের দিককোণ জানতে হলে ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ণয় করতে হবেঃ

(১) স্থান দুটিকে পেন্সিলের সাহায্যে এক রেখায় মিলাতে হবে। প্রয়োজন বোধে উক্ত রেখাটি নির্দিষ্ট স্থানের পরও বর্ধিত করে নেয়া যেতে পারে। অতঃপর অবস্থানের উপর সার্ভিস প্রট্র্যাক্টরের তীরের অগ্রভাগ রেখে একে উপরোক্ত রেখার দিকে রাখতে হবে। অতঃপর উক্ত রেখাটি সার্ভিস প্রট্র্যাক্টরের যে ডিগ্রীর সাথে মিলে যাবে ইহাই হবে নির্দিষ্ট অবস্থানের গ্রিড দিককোণ। সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর অবস্থানের ডান দিকে থাকলে বাইরের সারির ডিগ্রী ও বামদিকে থাকলে ভিতরের সারির ডিগ্রী পড়তে হবে। সাধারণতার সাথে দিককোণ পড়া উচিত। কারণ ম্যাপের উপর কোন গ্রিড দিককোণের যদি ১ ডিগ্রীর পার্থক্য হয়, তবে ভুমির এক মাইল দূরত্বে প্রায় ৩০ গজ পার্থক্য হবে। সুতরাং ম্যাপে গ্রিড দিককোণ স্থাপন বা পঠনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিতঃ

(ক) খুব সূক্ষ্ম পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে।
(খ) গাছ বা এ জাতীয় বস্তুও নিম্নাংশে ও অন্যান্য বস্তুও কেন্দ্রে সার্ভিস প্রট্র্যাক্টরকে তীর চিহ্ন স্থাপন করতে হবে।
(গ) প্রট্র্যাক্টরকে গ্রিড লাইনের সমান্তরাল রাখতে হবে।
(ঘ) এর ভিতরের ও বাহিরের সারির ডিগ্রীর ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে।

৩। **<u>রোমারঃ</u>** প্রট্র্যাক্টরে যে রোমারটি থাকে তা শুধুমাত্র ১ঃ৫০০০০ ম্যাপের জন্য উপযুক্ত। ম্যাপে কোন বস্তুও স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য রোমার খুবই উপযোগী। রোমারে উল্লম্ব এবং অনুভূতিক দুটি স্কেল দাগাঙ্কিত রয়েছে। উভয় স্কেলের দশটি মূল ভাগ রয়েছে। এবং প্রত্যেক মূল ভাগের দুটি গৌণ ভাগ রয়েছে। ম্যাপে কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করার জন্য প্রথমে রোমারের অনুভূতিক স্কেলকে যে বর্গে অবস্থিত সে বর্গেও নিম্ন নর্দিং লাইনের উপর স্থাপন করতে হবে। তারপর রোমারকে নর্দিং লাইনের উপর এমনভাবে সরাতে হবে যাতে রোমারের উল্লম্ব স্কেল বস্তুটির সাথে মিলিত হয়। এখন রোমারের দুটি স্কেলের পাঠ নিতে হবে। দুটি স্থানাঙ্কেও দূরত্বেও রোমারের সাহায্যে বের করা যায়।

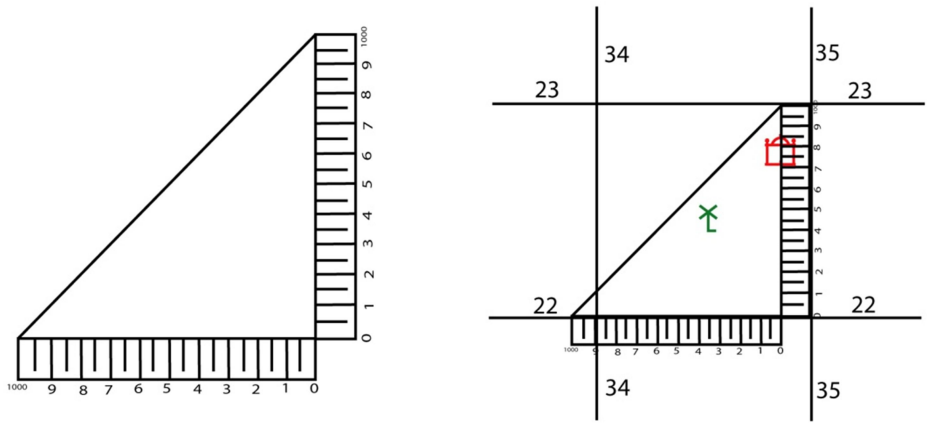

চিত্রঃ রোমার

চাক্ষুষ নকশা ও স্মৃতি নকশা

১। **ভূমিকাঃ** মানচিত্র বা ম্যাপ একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। ইহা দ্বারা আমরা ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিকও কৃত্রিম বস্তু সমূহের পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে পারি।বাংলাদেশে সার্ভে বিভাগ যথেষ্ট সময় ও শ্রমের মাধ্যমে ম্যাপ প্রস্তুত করে থাকে। তাই পরিবর্তনশীল ভূ-পৃষ্ঠের সকল তথ্য ম্যাপ হতে আমরা সকল সময় আশা করতে পারি না। যুদ্বের সময় সঠিক পরিকল্পনা প্রনয়ন এসব তথ্য একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধ সংক্রান্ত আদেশ ও তথ্যাদি প্রদানের সহায়তা করলেও যেহেতু পৃথিবী পরিবর্তনশীল তাই সময়োপযোগী তথ্য আমরা ম্যাপ হতে আসা করতে পারি না । তাই যুদ্ধের জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও ইহা বাস্তবায়নের জন্য ম্যাপের সম্পূরক হিসেবে এয়ার ফটোগ্রাফী ও চাক্ষুষ বা স্মৃতি নকশা এখনও প্রয়োজন তাই যুদ্ধক্ষেত্রে পেন্সিল, রোলার, সার্ভিস প্রট্র্যাক্টর ও কম্পাসের সাহায্যে চাক্ষুষ নকশা বা স্মৃতি নকশা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। এ নকশা শুধু যুদ্ধে সৈনিককেই সাহায্যে করে না বরং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষকে ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহনের সহায়তা করে ।

২। **চাক্ষুষ নকশাঃ** বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এলাকাকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের পর উক্ত এলাকাতে অবস্থান করে যদি ঐ এলাকাটির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত নকশা প্রস্তুত করা হয় তাকে চাক্ষুষ নকশা বলে।

৩। **স্মৃতি নকশাঃ** সময় সুযোগের অভাবে অনেক সময় এলাকায় বসে নকশা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে উক্ত এলাকাটি তড়িৎ পর্যবেক্ষন করে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে নিরাপদ স্থানে বসে উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজের স্মৃতি থেকে যে নকশা প্রস্তুত করা হয় তাই স্মৃতি নকশা।

৪। **প্রস্তুত প্রনালীঃ** নিম্নলিখিত নিয়মে নকশা প্রস্তুত করতে হবে।

ক। মাপনী নির্ধারন।
খ। ভিত্তিরেখা নির্ধারন।
গ। উল্লেখযোগ্য বস্তু স্থাপন (রুলিং পয়েন্ট)।
ঘ।বিস্তারিত তথ্য স্থাপন।

৫। **নকশা অংকনের সময় লক্ষনীয় বিষয় সমূহ।**

ক। কাগজ বা কাপড়ের উপর নির্দিষ্ট এলাকার নাম লিখতে হবে।
খ। ভূমির বস্তু সমূহ সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।
গ। ভূমির বন্ধুরতা সম্মোন্নতি রেখার পরিবর্তে আকৃতিতে রেখার সাহায্যে অংকন করতে হবে।
ঘ। নকশায় কোন বস্তুর নাম লিখতে হলে শিরোনামের সাথে সমান্তরাল করে লিখতে হবে।
ঙ। নকশায় সড়ক, রেল লাইন যেখানে শেষ হয় সেখানের নিকটবর্তী কোন প্রসিদ্ধ স্থানের নাম গুরুত্ব সহ লিখতে হবে।
চ। নদী বা খাল-বিল থাকলে তীর চিহ্নের সাহয্যে পানি প্রবাহের দিক দেখাতে হবে।
ছ। মার্জিনের বাম দিকে তারিখ আবহাওয়া, সময় ও স্থান লিখতে হবে।
জ। নকশার নিচে ডান দিকে প্রস্তুতকারীর নাম, নম্বর, পদবী ও ইউনিট লিখতে হবে।

৬। **নকশায় সাংকেতিক ও সামরিক চিহ্নের ব্যবহারঃ** শুধু সম্মোন্নতি রেখার পরিবর্তে আকৃতিগত রেখা ব্যতীত ম্যাপের মতই নকশায় সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তু দেখতে হয় নিদিষ্ট এলাকায় নিজস্ব অবস্থান,শত্রুর অবস্থান, গোলাবারুদ, হাতিয়ার প্রতিবদ্ধকতা, রেশন ও পানি সরবরাহ কেন্দ্র ইত্যাদি দেখানো বিশেষ নির্দেশ থাকলে ইহা অনুমোদিত সামরিক প্রতিকের মাধ্যমেই দেখাতে হবে।

চাক্ষুষ নকশা

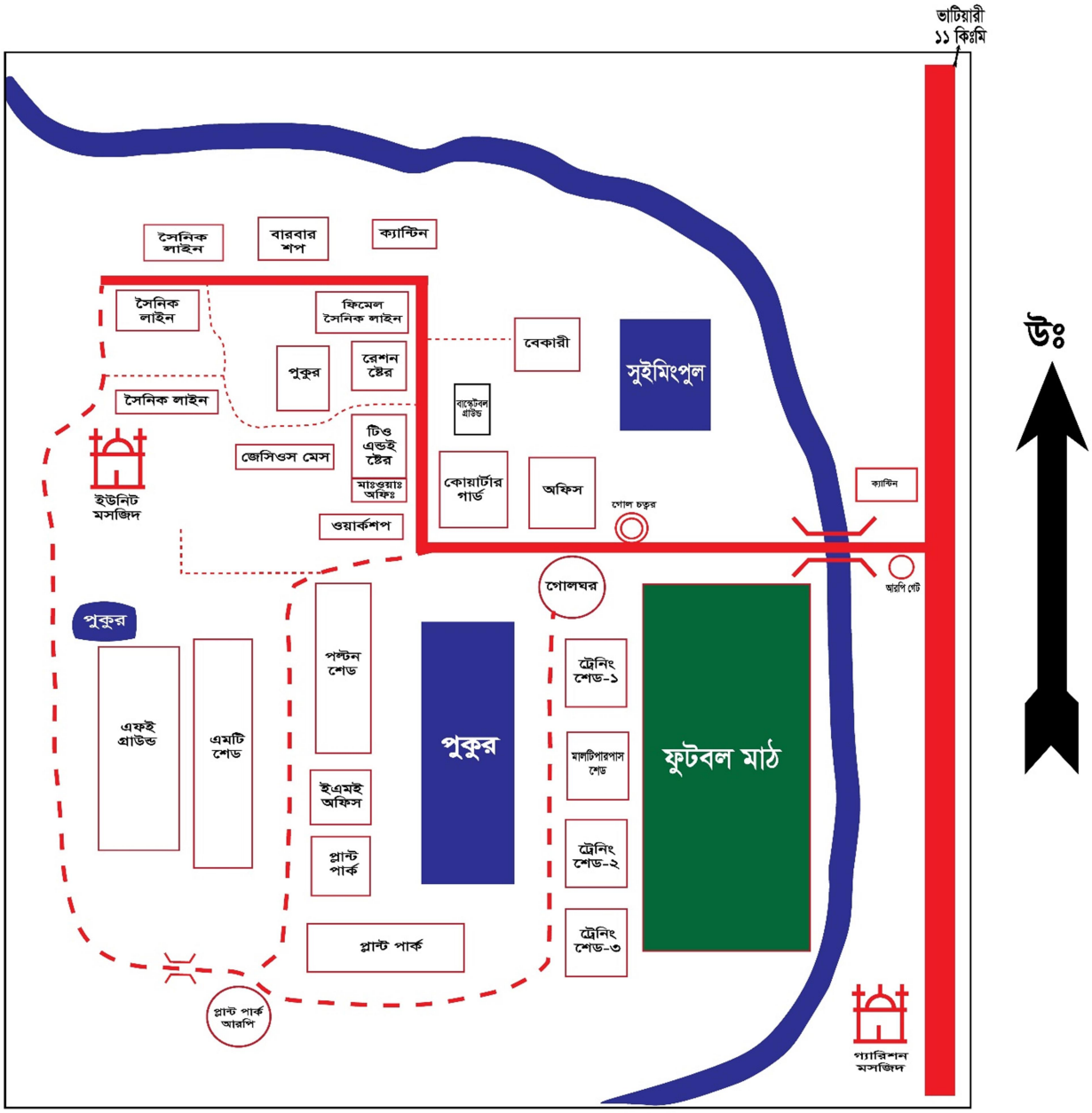

মাপনী বিহীন

১ ইঞ্চি = ৩০০ গজ আ. ভ. ১ঃ ১০,৮০০

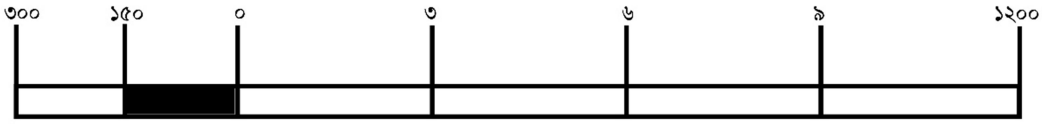

মাপনী রেখার দৈর্ঘ্য = ৫ ইঞ্চি

নাইট মার্চ চার্ট তৈরী করণ ও এর ব্যবহার

১। **ভূমিকাঃ** দিবালোকে বিমান ও দৃষ্টির আড়ালে থেকে মার্চ করা কঠিন, এজন্য সশস্ত্র বাহিনীতে যুদ্ধকালীন চলাচল সাধারণঃ রাত্রীকালেই হয়ে থাকে ফলে রাস্তা ভুলে গিয়ে সঠিক স্থানে পৌছা কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং রাত্রে মার্চ করার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

২। **প্রস্তুতি মূলক কাজঃ** রাত্রীকালীন মার্চের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি মুলক কাজ প্রয়োজন। কাজগুলো নিম্নরুপঃ

ক। রুট নির্বাচনঃ সব সময় কম দুরত্বের পথ নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। পথিমধ্যে প্রাকৃতিক বাঁধা থাকতে পারে বা শত্রু সৈন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে সম্পূর্ণ পথটিকে কতগুলো ধাপে বিন্যস্ত করতে হবে। রুট নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

(১) অপ্রতিরোধ্যে বাধাগুলো এড়িয়ে যেতে হবে।

(২) প্রত্যেক ধাপের শেষে চেনা যায় এমন ভূমি নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) প্রতিটি ধাপের দূরত্ব যেন খুব বেশি না হয়, আবার খুব কমও না হয়। সাধারণত ইহা ৫০০ থেকে ১০০০ কদমের মধ্যে ভাল হয়। মনে রাখতে হবে যে, মার্চের সময় প্রতি ১ ডিগ্রি ভূলের জন্য প্রতি এক মাইলের মার্চে ৩০ গজ ভূল হয়।

খ। চার্ট প্রস্তুত করণঃ পরিকল্পিত রাস্তায় বিভিন্ন ধাপে অবস্থিত বড় বা বিশিষ্ট বস্তু বা স্থানের দিককোন ও দুরত্ব মৌখিক ভাবে মনে রাখা দুস্কর। কাজেই ঐ সমস্ত দিককোন ও দুরত্ব অবলম্বনে চার্ট তৈরী করা উচিত। নীল বা কালো কালিতে লেখা চার্টগুলো রাতের অন্ধকারে দেখা যাবেনা। আকাশ পরিস্কার থাকলে লাল বাতিতে চার্ট করা যায়। বনাঞ্চালে লাল বাতিতে প্রস্তুত চার্ট পড়া কষ্ট কর। এমতাবস্থায় সংখ্যা ও সাংকেতিক চিহ্ন গুলোকে সুচঁ বা কাটার সাহায্যে ফুটোকরে আকাশ পানে তুলে ধরলে সেগুলোকে পরিস্কার ভাবে পড়া যাবে। তাছাড়া সে লেখাগুলো ছুরি বা ব্লেড দ্বারা সুন্দর ভাবে কেটে ও উপরিল্লিখিত নিয়মে পড়াযেতে পারে। নিম্নেলিখিত তিন ধরণের চার্টের যেকোন একটি রাত্রিকালীন মার্চের জন্য ব্যবহার করা যায়।

(১) রুট চার্ট

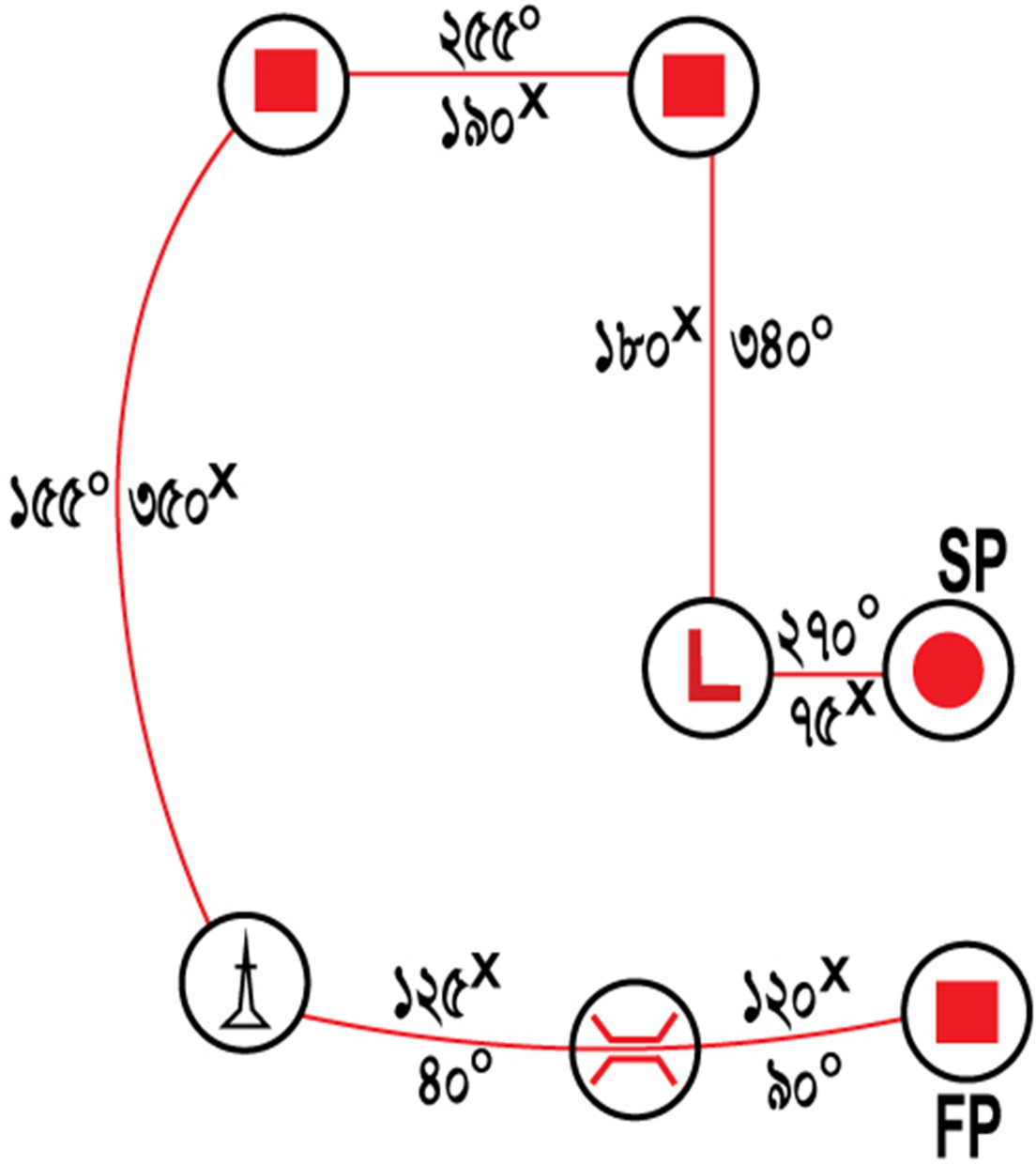

(২) কনভার্শন চার্ট।

ধাপ	স্থানাঙ্ক	দিককোণ	দূরত্ব	লক্ষ্যবস্তু	চিহ্ন
১	৮৫৭৭৯৮	-	-	গোল ঘর	
২	৮৫৭৭৯৭	২৭০°	৭৫ x	রুট ব্যান্ড	
৩	৮৫৭৭৯৯	৩৪০°	১৮০ x	আপ্যায়ন	
৪	৮৫৫৭৯৭	২৫৫°	১৯০ x	২০ কোঃ মেস	
৫	৮৫৬৭৯৬	১৫৫°	৩৫০ x	ইলেক্ট্রিক পাইলন	
৬	৮৫৭৭৯৬	৪০°	১২৫ x	ব্রীজ	
৭	৮৫৭৭৯৭	৯০°	১২০ x	ট্রেনিং শেড	

(৩) ধাপ চার্ট

দূরত্ব	দিককোণ	চিহ্ন
১২০x		
	৯০°	
১২৫x		
	৪০°	
৩৫০x		
	১৫৫°	
১৯০x		
	২৫৫°	
১৮০x		
	৩৪০°	
৭৫x		
	২৭০°	

গ। **কম্পাস স্থাপনঃ** রাত্রে চলাচলের পূর্বে প্রতিটি ধাপের জন্য আলাদা আলাদা কম্পাস স্থাপন করে ক্রমান্বয়ে নাম্বার দিয়ে রাখতে হবে। একাধিক কম্পাস না থাকলে একটি কম্পাস দ্বারা এ কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপ দিয়ে পুনরায় কম্পাস স্থাপন করতে হবে।

ঘ। **সদস্যদের ব্রিফিং দেয়া ও উদ্দেশ্য জানানোঃ**

(১) প্রত্যেক সদস্য করণীয় ও অকরণীয় সম্পর্কে জানবে।
(২) প্রত্যেক সদস্য প্রতিটি পর্যায়ের কাজ ভালভাবে জানবে।
(৩) মার্চের লক্ষ্য সম্পর্কে সদস্যরা সবাই জানবে।
(৪) চলা, থামা, শত্রু ইত্যাদি বিষয়ে সংকেতাদি সকলে অবশ্যই জানবে।

ঙ। **নিরাপত্তা ও উপদেশাবলীঃ**

(১) এমন কোন নড়াচড়া বা শব্দ করা উচিত নয়, যা দ্বারা কার্য প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে।
(২) এ সময় কোন প্রকারের আলো প্রজ্বলন করা নিষেধ। তবে দিক কোন পরিবর্তন দরকার জন্য আলোজ্বালাতে হলে গোপনীয়তা অবলম্বন করা উচিত।
(৩) সহকারী পথপ্রদর্শক কোন মতেই পিছনে ঘুরবে না, প্রয়োজন বোধে পথপ্রদর্শক তার কাছে যাবে।
(৪) নির্দিষ্ট ইঙ্গিত বা সংকেতাদি বুঝতে যেন কোন সন্দেহ না থাকে।
(৫) মাঝে মাঝে পথ প্রদর্শক হিসাব রক্ষকের নিকট হতে দুরত্ব জানবে।
(৬) ব্যবহার করার পূর্বে কম্পাসের রেডিয়াম যুক্ত স্থান গুলোকে দুই তিন মিনিট পর্যন্ত টর্চের আলোকে আলোকিত করা উচিত।

৩। **রাত্রীকালীন মার্চের সংগঠন ঃ** রাত্রীকালীন মার্চের জন্য কমপক্ষে ০৩ জন বুদ্ধিমান ও চৌকুষ সৈনিক প্রয়োজন। নিম্নে তাদের কার্যাবলী দেওয়া হলোঃ

ক। পথ প্রদর্শকঃ প্রকৃত পক্ষে এ মার্চের পূর্ণ কার্যভার পথপ্রদর্শকের উপর ন্যস্ত থাকবে। দিক কোন স্থাপিত সমস্ত কম্পাস তার কাছে থাকবে। এছাড়াও পথ প্রদর্শকের কাছে মার্চের জন্য প্রস্তুতি চার্ট ও দুই ফিট দীর্ঘ একটি ছড়ি বা লাঠি রাখতে হবে। কাগজ বা সাদা রং এর সাহায্যে ছড়িটির অগ্রভাগ ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি জায়গা সাদা করে নিতে হবে যাতে অন্ধকারে দেখা যায়। গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পূর্বে পথ প্রদর্শক সহকারী পথপ্রদর্শকে এই মর্মে সাবধান করবে যে, গন্তব্য স্থল অতি সন্নিকটে রয়েছে। পথ প্রদর্শক সহপথপ্রদর্শকের কাছেযাবে কিন্তু সহপথ প্রদর্শক কখনও পথ প্রদর্শকের কাছে আসবে না।

খ। সহকারী পথ প্রদর্শকঃ লক্ষ্য বস্তু বরাবর রাস্তার অনুসন্ধানে সহপথ প্রদর্শক সকলের সম্মুখে থাকবেন। তার পিঠে এক ফিট বর্গের সাদা কাগজ বা কাপড়ের টুকরা বেধে দিতে হবে। যেন অন্ধকারেও কিছু দূরত্ব পর্যন্ত তাকে দেখা যায়। তিনি পথ প্রদর্শক কর্তৃক নির্দিষ্ট বা তারকার দিক চলবে। পথ প্রদর্শক লক্ষ্য রাখবে যেন সে দৃষ্টির বাইরে না চলে যায়। প্রয়োজন বোধে সহকারী পথ প্রদর্শককে সংকেতের মাধ্যমে থামিয়ে পথ প্রদর্শক ও হিসাব রক্ষক তার কাছে যাবে। সহ পথ প্রদর্শক ভূলেও পিছনে ঘুরবে না।

গ। হিসাব রক্ষকঃ পথ প্রদর্শকে সর্ব প্রকার সাহায্য করা হিসাব রক্ষকের কাজ। মার্চের দূরত্ব পরিমান করা ও এর হিসাব রাখা তারই কর্তব্য। দূরত্বের হিসাব রাখার জন্য নুড়ি পাথর বা সীমের বীজ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি ১০০ গজের জন্য সাধারণত ১টি নুড়ি ব্যবহার করা হয়। গন্তব্য স্থানের ১০০ গজের মধ্যে আসার সাথে সাথে পথ প্রদর্শকে উহা অবগত করিবেন।

৪। <u>কর্মপন্থাঃ</u> দিককোণে স্থাপিত এক নম্বর কম্পাসের সাহায্যে প্রথম লক্ষ্যবস্তুর দিক ঠিক করতে হবে। কম্পাসটিকে খুলে এর ঢাকনি প্রায় ৪৫ ডিগ্রী সামনে ঝুকাতে হবে। তারপর কম্পাসকে ডান হাতের তালুতে রেখে এতটুকু ঘুরাতে হবে যেন চৌম্বকতীর দিকচিহ্নের নীচে আসে। সাদা ছড়িটিকে সূক্ষ্ম রেখায় মিলিয়ে সেদিকে কোন বিশিষ্ট বড় বস্তুকে নির্দিষ্ট করতে হবে। কোন বিশিষ্ট বস্তু না পাওয়া গেলে তারকার সাহায্যে মার্চ করতে হবে।

৫। <u>তারকার সাহায্যে দিক ঠিক রাখাঃ</u> আমরা পূর্বেই তারকা মন্ডলীর গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছি। তাছাড়াও নিম্নেলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে তারকার দিক ঠিক রাখা সম্ভব।

ক। যে কোন তারকার দিককোন কম্পাসের মাধ্যমে বা ধ্রুবতারার সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

খ। দিগন্ত রেখা এর নিচে ধুলাবালী, কুয়াশা বা বিভিন্ন গাছপালা বাড়ি ঘরের জন্য দৃশ্যমান হয় না। আবার ৪০ ডিগ্রী এর উপরের তারা ও দিক নির্ণয়ে সুবিধাজনক নয়। তাই ১৫ ডিগ্রী হতে ৩৫ ডিগ্রীর মধ্যে তারকা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

গ। তারকাগুলো পূর্ব হতে পশ্চিমে অবস্থান পরিবর্তন করে এবং অধিকাংশ তারকাই উত্তর গোলার্ধে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হল বাম চক্রে ঘোরে। তারকা নির্ধারনের এ সমস্ত বিষয় মনে রাখতে হবে।

ঘ। প্রতি দশ মিনিট পরপর তারকা পরিবর্তন করতে হবে কারণ ধ্রুবতারা ব্যতীত সকল মনে রাখতে হবে।

৬। <u>বাঁধা অতিক্রমঃ</u> অনেক সময় চার্ট তৈরি করার সময় ম্যাপে কোন বাধা অনুমান করা সম্ভব হয় না। আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্য কোন বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় সহপথ প্রদর্শক বাধার সন্নিকটে থেমে যায়। পথ প্রদর্শক ও হিসাব রক্ষক তার নিকট আসলে সে আশে পাশে কোন সুগম স্থানে বাধা অতিক্রম করে অপর পারে চলে যাবে এবং পথ প্রদর্শকের সম্মুখে নির্দিষ্ট দিককোণ দাড়াবে। দিক নিশ্চিত করবার পর পথ প্রদর্শক ও হিসাব রক্ষক ডানে বা বামে ঘুরে তার কাছে চলে যাবে। এভাবে মার্চ সম্মুখে বজায় রাখবে। বাধার প্রস্ততা বেশী হলে বা এর অপর পার দৃষ্টির বাইরে থাকলে উপরিল্লিখিত নিয়মে ইহা পার হওয়া কঠিন। তখন দিককোন পরিবর্তন করে ডানে বা বামে ঘুরে বাধাটি অতিক্রম করতে হবে।

৭। <u>পার্বত্যাঞ্চলে মার্চের নিয়মঃ</u> পার্বত্যাঞ্চালে ও উপরিল্লিখিত নিয়মে রাতে মার্চ করতে হবে। অবশ্যই সেখানে চলাফেরা কষ্টকর, আবার নির্দিষ্ট দিক ঠিক রাখাও কষ্টকর। কারণ পাহাড় ঢালু, নদী নালা ইত্যাদি আছে। যাতে রাতে তো দুরের কথা দিনের বেলায়ও অতিক্রম করা কঠিন। তাই পার্বত্যাঞ্চলে মার্চ করতে হলে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে।

ক। দিনের বেলায় স্কাউট পাঠিয়ে নির্দিষ্ট রাস্তা অনুসন্ধান করে নিতে হবে।

খ। নির্দিষ্ট রাস্তায় দিনের বেলাতেই মাঝে মাঝে চুনা লাগিয়ে দেওয়া উচিত। চুনা না পাওয়া গেলেও সুরু তার, ফিতা, লতা ইত্যাদি বিছিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে।এছাড়াও দাগ কেটে বা পথে ইট, পাথর ইত্যাদি রেখেও রাস্তা চিহ্নিত করা যায়।

মানচিত্র এর চাহিদা, সংগ্রহ ও জমা করার নিয়মাবলী

১। মানচিত্র চাহিদাকরন পদ্ধতিঃ

ক। অপারেশন এবং প্রশিক্ষণ মানচিত্রের চাহিদা ঘাটতি/প্রতিস্থাপক চাহিদা/সার্ভে বোর্ডের অনুকূলে হলে বরাত ক অনুযায়ী প্রাধিকৃত আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং মানচিত্রের চাহিদা অবশ্যই বিএএফও-২৭৯০ (বড়) ফরমে করতে হবে।

খ। চাহিদাপত্র যদি এন এ এর অনুকূলে হয় তবে এন এ এর সত্যায়িত ফটোকপি চাহিদা পত্রের সাথে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।

গ। চাহিদাপত্র যদি অকেজোকরণ/সার্ভে পর্ষদের অনূকুলে হয় তবে অকেজোকরণ/সার্ভে পর্ষদের মূলকপি ও বোর্ড প্রসেসিং ফরম (বিএএফজেড-৩০৭৩) চাহিদাপত্রের সাথে অবশ্যই সংযুক্ত থাকতে হবে এবং অকেজোকরণ/সার্ভে পর্ষদের সভাপতি/সদস্য সঠিকভাবে নির্বাচন ও স্বাক্ষর আছে কিনা তা দেখতে হবে।

ঘ। চাহিদাপত্র যদি হারানো/ক্ষয়ক্ষতির অনুকূলে হয় তবে ইউনিট কর্তৃক তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণী এবং তদন্ত আদালতের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী নিয়মে বরাত ক অনুসারে নির্ধারিত টাকা সরকারী কোষাগারে টি আর করতঃ টি আর কপি চাহিদাপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ। প্রতিটি চাহিদাপত্রের সাথে পূর্বের চাহিদা করা হয় নাই এই মর্মে ইউনিট অধিনায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

চ। মানচিত্র চাহিদার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফরমেশনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানীকে অবগতি পূর্বক প্রশিক্ষণ হলে এমটি পরিদপ্তর এবং অপারেশন হলে এমএ পরিদপ্তরে প্রয়োজনীয় চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে।

ছ। অপারেশন এবং প্রশিক্ষণ মানচিত্রের চাহিদা অবশ্যই প্রাধিকার অনুযায়ী করতে হবে এবং আলাদা আলাদা ভাবে করতে হবে।

জ। চাহিদাপত্রের উপরে ডান কর্ণারে বড় অক্ষরে অবশ্যই লাল কালি দ্বারা চাহিদার কারণ উল্লেখ করতে হবে। যেমনঃ প্রথম ফরমাস, অপচয়, ঘাটতির অনুকূলে চাহিদা, সার্ভে পর্ষদ/প্রতিস্থাপক চাহিদার অনুকূলে অথবা এর এ এর অনুকূলে চাহিদা ইত্যাদি।

২। অকেজো মানচিত্র জমা করণঃ

ক। ক্রোড়পত্রের অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী অকেজো/সার্ভে পর্ষদ গঠনের মাধ্যমে ইউনিট কর্তৃক মানচিত্র সমূহ অকেজো করতে হবে।

খ। ৫৭ ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানীতে ম্যাপ জমা করার জন্য তারিখ বরাদ্দ চেয়ে সরাসরি পত্রালাপ করতে হবে। বরাদ্দকৃত দিনে কোন কারণ ব্যতিরেকে অবশ্যই ম্যাপ জমা করতে হবে। কোন কারণে অনুপস্থিত হলে পরবর্তীতে পুরনায় চিঠির মাধ্যমে জমা করার নতুন তারিখের জন্য বরাদ্দ চাইতে হবে।

গ। অকেজো মানচিত্র সমূহ জমা করার সময় অকেজোকরণ/সার্ভে পর্ষদের মূলকপি ও বোর্ড প্রসিডিং ফরম (বিএএফজেড-৩০৭৩) অবশ্যই সংগে আনতে হবে।

ঘ। অফিস সীলমোহর ও অধিনায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত প্রাধিকার পত্র সংগে আনতে হবে।

ঙ। ইউনিট কর্তৃক আইভি নম্বর উল্লেখ পূর্বক ০৪ কপি প্রি রিসিভ ভাউচার (বাসেফসা-২০৯৬) অফিস সীলমোহর অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরান্তে অবশ্যই সংগে আনতে হবে।

চ। মানচিত্র জমা করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে উইপোকায় খাওয়া, আগুনে পোড়া অথবা ব্যক্তিগত অবহেলা জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কোন ক্রমেই জমা করা যাবে না।

ছ। অবহেলা জনিত কারণে মানচিত্রের অপচয়/ক্ষতি নির্ধারনকল্পে তদন্ত আদালতে বসাতে হবে এবং তদন্ত আদালতের সুপারিশ অনুযায়ী ক্রোড়পত্রের অনুচ্ছেদ ৬ এ উল্লেখিত অর্থ কোডে, করি নং ০৪/২০০৯ অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ-৭) সরকারী কোষাগারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৩। **মানচিত্র সংগ্রহ।**

ক। অপারেশন হলে এমএ পরিদপ্তর এবং প্রশিক্ষণ হলে এমটি পরিদপ্তর হতে ইউনিট কর্তৃক প্রেরিত চাহিদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৫৭ ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানী কর্তৃক সংগ্রহ করার তারিখ পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে।

খ। নির্ধারিত তারিখে ইউনিট কর্তৃক আরভি নম্বর উল্লেখ পূর্বক ৪ কপি ইস্যু ভাউচার (বিএএফজেড-২০৯৬) অফিস সীলমোহর ও অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরান্তে সংগে আনতে হবে।

গ। অফিস সীলমোহর ও অধিনায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত প্রাধিকারপত্র সংঙ্গে আনতে হবে।

ঘ। যদি এন এ এর অনুকূলে চাহিদা হয় তবে এন এ এর মূলকপি সংঙ্গে আনতে হবে।

ঙ। যদি অকেজোকরণ/সার্ভে পর্ষদের চাহিদা হয় তবে অকেজোকরণ/সার্ভে পর্ষদের সত্যায়িত ফটোকপি ও বোর্ড প্রসেসিং ফরম বিএএফজেড-৩০৭৩) সংঙ্গে আনতে হবে।

৪। **মানচিত্রের ভাউচার বিতরণঃ**

ইউনিট কর্তৃক মানচিত্র সংগ্রহ ও জমা উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়মে ভাউচার বিতরণ করতে হয় যেমনঃ

ক। প্রশিক্ষণ মানচিত্র হলে ডিপো কপি, অফিস কপি, ইউনিট কপি ও সেনাসদর, জিএস শাখা সামরিক পরিদপ্তর (এমটি পরিদপ্তর) কপি।

খ। অপারেশন মানচিত্র হলে ডিপো কপি, অফিস কপি, ইউনিট কপি ও সেনাসদর, জিএস শাখা সামরিক অপারেশন পরিদপ্তর (এমও পরিদপ্তর) কপি।

৫। **মানচিত্র অকেজো/সার্ভে পর্ষদের সভাপতি ও সদস্য নিম্নরুপঃ**

ক। সভাপতিঃ উপ-অধিনায়ক অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিটের একজন ফিল্ড অফিসার।

খ। সদস্য-১ঃ একজন অফিসার অথবা জেসিও নিয়োগ মাইনর ইউনিট।

গ। সদস্য-২ঃ একজন অর্ডন্যান্স প্রতিনিধি (ডিএডিওএস/ষ্টাফ ক্যাপ্টেন (অর্ডঃ)/ডিব/বিগ্রেড/সাব এরিয়া অর্ডন্যান্স জেসিও)

৬। **সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা করার কোডঃ** ম্যাপ ক্রয় এবং রক্ষনাবেক্ষণ খাতে ভ্যাট কোডে অর্থ জমা করা যেতে পারে।

কোড নং														
	১	১	৯	৩	১	০	১	০	০	১	৯	০	১

৭। **<u>মানচিত্রের ক্ষতিপূরণ মূল্য (করি নং ৪/২০০৯)ঃ</u>** শান্তিকালীন সময়ে অবহেলাজনিত কারণে অপারেশন ও প্রশিক্ষণ মানচিত্রের অপচয়/ক্ষতি হলে বর্তমান মানচিত্র মুদ্রন খরচ এর সাথে ১০% ডেমারেজ চার্জ যোগ করে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

ক্র/নং	মানচিত্রের স্কেল	প্রতিটি সীটের মূল্য (এনালগ/ডিজিটাল)	মন্তব্য
১।	১ঃ২৫,০০০	২৩১.০০ (দুইশত একত্রিশ) টাকা মাত্র।	
২।	১ঃ৫০,০০০		
৩।	১ঃ২,৫০,০০০		
৪।	১ঃ৫,০০,০০০		
৫।	১ঃ১০,০০,০০০		

সাংকেতিক চিহ্নের বর্ণনা ও অংকন

১। **ভূমিকাঃ** সামরিক ম্যাপ বা অন্য কোন ম্যাপ খুললেই নানা ধরনের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এ চিহ্নগুলির আকৃতি এবং রং ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির চিহ্ন, আবার কোথাও লেখা রয়েছে শব্দ বা শব্দ সংক্ষেপ। ভূপৃষ্ঠের উপর বহু প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তু বিদ্যমান। কোন এলাকায় ম্যাপ প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য বস্তুগুলো অংকন আবশ্যক। চয়নকৃত বস্তুগুলোর আকৃতি ঠিক রেখে ম্যাপে অংকন করা হয়। যে কারণে দেশীয় ম্যাপে যে কোন সংস্করণে এমনকি সারা বিশ্বে ও ম্যাপে প্রায় একই সাংকৃতিক চিহ্ন হতে দেখা যায়। ছোট মাপনী ও বড় মাপনী ম্যাপে সংশ্লিষ্ট চিহ্নগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। কতিপয় বস্তুর প্রকৃত অবস্থান এর কেন্দ্রে বিদ্যমান যেমন নদী, রাস্তা, রেলপথ, পুকুর ইত্যাদি। আবার কতিপয় বস্তুর প্রকৃত অবস্থান এর পাদদেশে। যেমনঃ মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ, গাছ ইত্যাদি।

২। **সাংকেতিক চিহ্নের সংজ্ঞাঃ** ভূ-পৃষ্ঠের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহকে ম্যাপে প্রকাশ করার জন্য দেশের জরিপ বিভাগ কর্তৃক যে সব চিহ্ন নির্ধারণ ও প্রচলন করা হয় তাকেই সাংকেতিক চিহ্ন বলে।

৩। **সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ কর্তৃপক্ষঃ** কোন কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে প্রকাশিত নকশা, চার্ট বা ম্যাপে ব্যবহারের জন্য নিজস্ব পদ্ধতিতে সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ ও প্রচলন করতে পারে। একটি দেশের সকল প্রকার ম্যাপের সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দেশের জরিপ বিভাগ। তাই আমাদের দেশে সাংকৃতিক চিহ্ন নির্ধারণ করেছে (বাংলাদেশ জরিপ বিভাগ)।

৪। **সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণের নীতিমালাঃ** মনগড়া কোন প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ করা হয় না। কতগুলো নীতিমালার উপর ভিত্তি করে সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ করা হয়। নীতিমালা গুলো নিম্নরুপঃ

ক। কোন কোন বস্তুকে পার্শ্ব থেকে যে আকারে দেখা যায় সেই বস্তুকে সেই আকারে অংকন করা হয়েছে। যেমনঃ মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ ও গাছ ইত্যাদি।

খ। কোন কোন বস্তুকে উপর থেকে লম্বভাবে যে আকারে দেখা যায় সেই বস্তুকে সেই আকারে অংকন করা হয়েছে। যেমনঃ ঘরবাড়ী ও ব্রীজ ইত্যাদি।

গ। কোন কোন বস্তুকে বাস্তবে যে আকারে দেখা যায় সেই বস্তুকে সেই আকারে অংকন করা হয়েছে। যেমনঃ বালু, নদী ও পুকুর ইত্যাদি।

ঘ। কিছু বস্তুর সাংকেতিক চিহ্নগুলো ম্যাপে অংকন কালে সর্বদা নির্দিষ্ট মাপনী অনুসরণ করা হয়নি। যেমনঃ রাস্তা ও রেল পথ ইত্যাদি।

ঙ। কতিপয় সাংকেতিক চিহ্নের সাথে অক্ষর বা শব্দ লিখে প্রকাশ করা হয়। যেমনঃ ডাকঘর (PO),বিশ্রামাগার (RH) ইত্যাদি।

৫। **সাংকেতিক চিহ্নের রং এর ব্যবহারঃ** সকল ম্যাপে বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন রং এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তবে স্বাভাবিক ভাবে রং এর ব্যবহার নিম্নরুপ হয়ে থাকেঃ

ক।	সবুজ	-	গাছপালা, বনজঙ্গল ও ঝোপঝাড় ইত্যাদি।
খ।	নীল	-	পানি সংক্রান্ত বস্তু প্রকাশের জন্য।
গ।	বাদামী	-	ভূমিরুপ যেমন সমোন্নতি রেখা, ভ্রুলেখ ও আকৃতিগত রেখা ইত্যাদি।
ঘ।	হলুদ	-	সকল প্রকার আবাদী ভূমি প্রকাশের জন্য।
ঙ।	লাল	-	রাস্তাঘাট স্থায়ী ঘর বাড়ী এবং কংক্রিট নির্মিত বস্তুর জন্য।
চ।	কালো	-	রেলপথ ধাতব নির্মিত ও মাটি জাতীয় বস্তু এবং শব্দ বা অক্ষর ইত্যাদি প্রকাশের জন্য।

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
১।	পাকা সড়ক	
২।	কাঁচা সড়ক	
৩।	সড়কের উপর মাইল ফলক	
৪।	গরুর গাড়ির রাস্তা	
৫।	উট বা খচ্চর চলার রাস্তা	
৬।	পায়ে চলার পথ	
৭।	জোড়া ব্রডগেজ রেলপথ	
৮।	একক ব্রডগেজ রেলপথ	
৯।	জোড়া মিটারগেজ রেলপথ	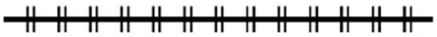
১০।	একক মিটারগেজ রেলপথ	
১১।	রেল ষ্টেশন	
১২।	সড়কের পুল	
১৩।	রেলপথের পুল	
১৪।	লেভেল ক্রসিং	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
১৫।	খাল	
১৬।	নদী	
১৭।	খাঁদ(কাটিং)	
১৮।	বাঁধ(এ্যাম্ব্যাংকমেন্ট)	
১৯।	কূয়া	
২০।	ঝর্ণা	
২১।	পুকুর	
২২।	বিল	
২৩।	জলাভূমি	
২৪।	গ্রাম	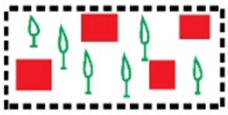
২৫।	বিচ্ছিন্ন গ্রাম	
২৬।	কুঁড়েঘর	
২৭।	দুর্গা	
২৮।	গির্জা	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
২৯।	মসজিদ	
৩০।	মাজার	
৩১।	মন্দির	
৩২।	কবরস্থান	
৩৩।	টেলিফোন লাইন	
৩৪।	বৈদ্যুতিক লাইন	
৩৫।	গাছ (বিভিন্ন রকমের)	
৩৬।	ফলের বাগান	
৩৭।	কাটা খাল	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
৩৮।	নির্মাণরত রেলপথ	
৩৯।	ট্রামওয়ে	
৪০।	খামওয়ালা পুল	
৪১।	নৌকার পুল	
৪২।	শুষ্ক খালের ভিতর সড়ক(কজওয়ে)	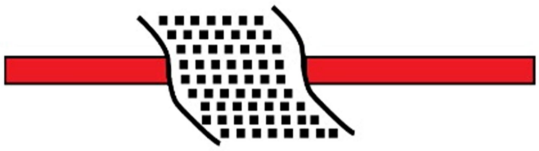
৪৩।	নদীতে পায়ে চলার পথ	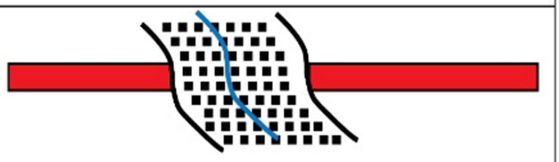
৪৪।	খেয়াঘাট	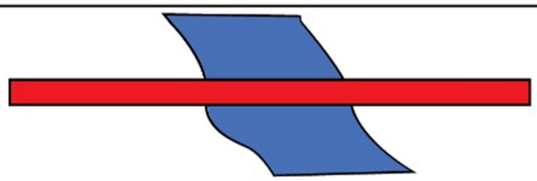
৪৫।	সুড়ং পথ	
৪৬।	রেলের উপরস্থ সড়ক	
৪৭।	রেলের নীচস্থ সড়ক	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
৪৮।	রজ্জু পথ	
৪৯।	খালের উপর তৈরি খাল	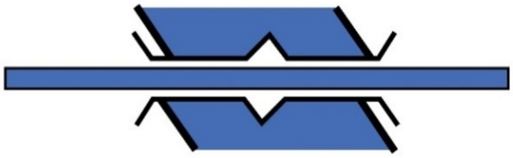
৫০।	থামওয়ালা রেলের পুল	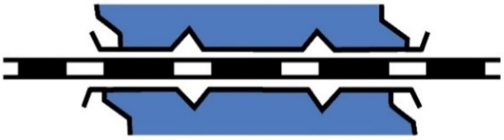
৫১।	বড় খাল	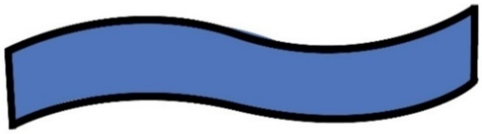
৫২।	শুস্ক খাল	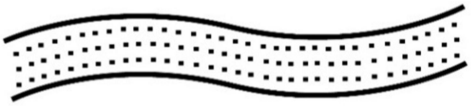
৫৩।	অল্প পানিওয়ালা নদী	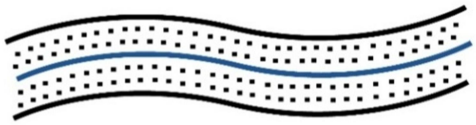
৫৪।	নদীর ভগ্ন পাড়	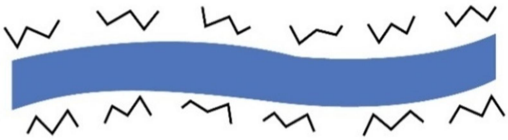
৫৫।	জলপ্রপাত	
৫৬।	নৌকাচালন ব্যবস্থাসহ খাল	
৫৭।	জোয়ার-ভাটা	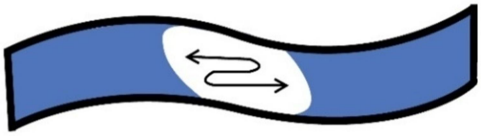

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
৫৮।	বাধঁ	
৫৯।	শুষ্ক বিল	
৬০।	কারেজ	
৬১।	পানির নল	
৬২।	তেলের নল	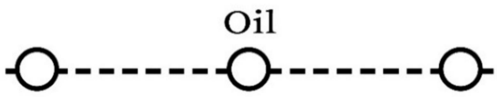
৬৩।	প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম	
৬৪।	জনশূন্য গ্রাম	
৬৫।	উচ্চ মিনার	
৬৬।	প্যাগোডা	
৬৭।	খ্রীস্টানদের কবর	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
৬৮।	সীমানা প্রস্তর (চিহ্নিত)	
৬৯।	সীমানা প্রস্তর (অচিহ্নিত)	
৭০।	তৈলকুপ	
৭১।	খনি	
৭২।	যুদ্ধক্ষেত্র	
৭৩।	এরোড্রাম	
৭৪।	বায়ুচালিত মিল	
৭৫।	বায়ুচালিত পাম্প	
৭৬।	আলোর স্তম্ভ	
৭৭।	বয়া	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
৭৮।	পোতাশ্রয়	
৭৯।	ত্রিকোণ উচ্চতা	
৮০।	বিন্দু উচ্চতা	
৮১।	বেঞ্চ মার্ক	BM 120
৮২।	আপেক্ষিক উচ্চতা	15 r
৮৩।	ঘাস	
৮৪।	বেত	
৮৫।	বাঁশ	
৮৬।	তালগাছ	
৮৭।	পাইন গাছ	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
৮৮।	খেজুর গাছ	
৮৯।	রাইফেল রেঞ্জ	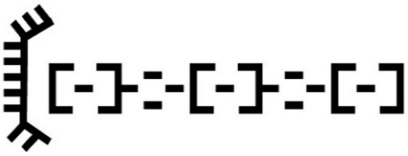
৯০।	মাশুল ঘর	
৯১।	আলোক পোত	
৯২।	মনসা গাছ	
৯৩।	কলা গাছ	
৯৪।	পানক্ষেত	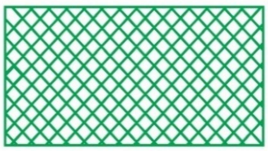
৯৫।	আন্তর্জাতিক সীমারেখা	
৯৬।	প্রদেশের সীমারেখা	
৯৭।	জেলার সীমারেখা	

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
৯৮।	ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড	C.G
৯৯।	সমোন্নতি রেখা	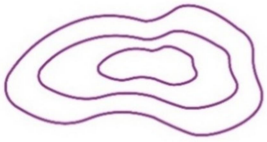
১০০।	আকৃতিগত রেখা	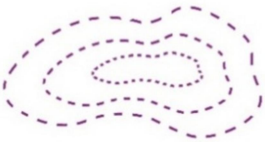
১০১।	ডাকঘর	PO
১০২।	তারঘর	TO
১০৩।	ডাকবাংলা	DB
১০৪।	পরিদর্শন বাংলা	IB
১০৫।	বিশ্রামাগার	RH
১০৬।	সার্কিট হাউজ	CH
১০৭।	ভ্রমনকারীর বিশ্রামাগার	TB

ক্রমিক নং	বস্তুর নাম	সাংকেতিক চিহ্ন
১০৮।	বৌদ্ধ কিয়াং	Kg
১০৯।	সংরক্ষিত জংগল	PF
১১০।	রক্ষিত জংগল	RF
১১১।	সরকারী জংগল	SF
১১২।	কুঁড়েঘর (অস্থায়ী)	
১১৩।	শস্যক্ষেত্র	
১১৪।	আন্তর্জাতিক সীমারেখা(অচিহ্নিত)	— X — X —
১১৫।	ঈদগাহ	
১১৬।	ব্রিজ	

সামরিক প্রতীকের বর্ণনা ও অংকন

১। **সামরিক প্রতীক (Military Symbol)ঃ** সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠান ও সরঞ্জামাদিকে রণকৌশলগত উদ্দেশ্য প্রণীত ম্যাপ বা নকশায় ব্যবহারের জন্য সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক যেসব চিহ্ন নির্ধারণ বা প্রচলন করা হয় তাকে সামরিক প্রতীক (Military Symbol) বলে। নির্দিষ্ট চিত্র, শব্দ, শব্দ সংক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয় রঙের সমন্বয়ে সামরিক প্রতীকগুলো প্রকাশ করা হয়।

২। **সামরিক প্রতীকের ব্যবহারঃ** সামরিক প্রতীক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়।

ক। সর্ব প্রকার যুদ্ধ ম্যাপ ও ওভার প্রিন্ট (All Types of Battle Maps Including Overprints)।
খ। সরেজমিন নকশা এবং ওভারলে (Field Sketches and Overlays)।
গ। বিমান থেকে নেওয়া ছবি (Air Photographs)।
ঘ। সাংগঠনিক ছক (Organizational Charts)।

৩। **অননুমোদিত প্রতীকঃ** নির্ধারিত সামরিক প্রতীক না থাকলে কিংবা সুস্পষ্ট ভাবে মনে না হলে নতুন প্রতীক প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে তা সংশ্লিষ্ট চার্টের পাদ টীকায় উল্লেখ করতে হবে।

৪। **রং এর ব্যবহারঃ** সামরিক প্রতীক অংকনে নিম্নেবর্ণিত রঙের ব্যবহারে করা হয়।

ক।	নীল	-	নিজস্ব বা মিত্র বাহিনী সংগঠন, অস্ত্রশস্ত্র এবং কার্যতৎপরতা প্রকাশ করার জন্য।
খ।	লাল	-	শত্রু বাহিনীর সংগঠন, অস্ত্রশস্ত্র এবং কার্যতৎপরতা প্রকাশ করার জন্য।
গ।	সবুজ	-	নিজস্ব এবং শত্রুর সর্বপ্রকার কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা যেমন, মাইনফিল্ড, কাঁটাতার, গর্ত, রাস্তার বাঁধা ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য।
ঘ।	হলুদ	-	পারমাণবিক ও জৈব রাসায়নিক ক্ষেত্র এবং দূষিত এলাকা প্রকাশ করার জন্য।

৫। **শব্দ ও অক্ষরঃ** প্রতীকের পার্শ্বে উল্লেখিত অক্ষরগুলো ইংরেজি বড় হাতের হবে এবং রঙ হবে। প্রতীকের অনুরুপ।

৬। **সামরিক প্রতিকের বিষয়ঃ** নিম্নের বিষয়াদি প্রকাশের জন্য সামরিক প্রতীক ব্যবহৃত হয়।

ক। আর্মস/সার্ভিস, সদর, প্রতিষ্ঠান ও পর্যবেক্ষণ অবস্থান।
খ। সৈন্যদলের আকার।
গ। এলাকা।
ঘ। চলাচল।
ঙ। অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি।
চ। বিবিধ তথ্যাদি।

মৌলিক সামরিক প্রতীক

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক	
১।	ইউনিট		
২।	ইউনিট সদর		
৩।	পর্যবেক্ষণ চৌকি	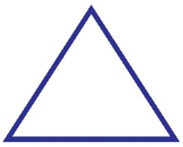	আর্টিলারি
৪।	প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান	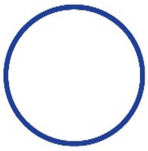	
৫।	ইলেক্ট্রনিক্স প্রতিষ্ঠান	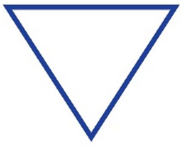	
৬।	অবতরণ স্থান	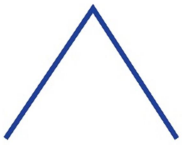	

অন্যান্য নির্দেশ

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	পদাতিক ব্যাটালিয়নের ভবিষ্যৎ অবস্থান	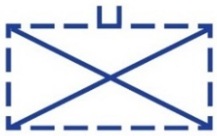
২।	শত্রুর অজানা পদাতিক ব্যাটালিয়ন	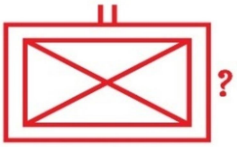
৩।	শত্রুর আকার না জানা সিগন্যাল ইউনিট	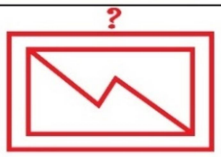
৪।	ধ্বংসপ্রাপ্ত আর্টিলারি গান	
৫।	ডামি স্ট্রং পয়েন্ট	
৬।	শক্তিবৃদ্ধিসহ ৮ ই বেংগল	
৭।	এয়ার ফিল্ড	
৮।	অবতরণ ক্ষেত্র	
৯।	দূষিত এলাকা	
১০।	দায়িত্বপূর্ণ এলাকা	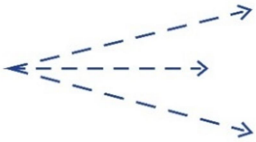

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১১।	আর্টিলারি রেজিমেন্টের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা	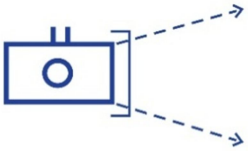
১২।	অনির্ধারিত অবস্থান	
১৩।	আরম্ভ স্থান	
১৪।	ত্যাগ করার স্থান	
১৫।	সংযোগ স্থান	
১৬।	নিয়ন্ত্রণ স্থান	
১৭।	দুর্বল স্থান	
১৮।	ব্যাটালিয়নের ভবিষ্যৎ অবস্থান	
১৯।	শত্রুর পূর্ব নির্ধারিত ইউনিট সদর	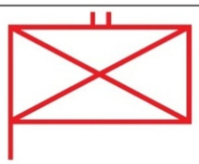
২০।	শত্রুর অজানা পদাতিক ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর	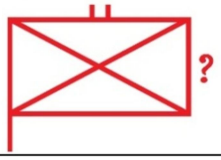
২১।	প্লাবিত এলাকা(Inundation)	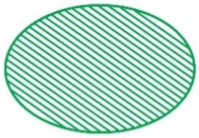

মৌলিক সামরিক প্রতীক

আর্মস/সার্ভিসেস এর মৌলিক প্রতীক		
ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	
২।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	
৩।	আর্মাড	
৪।	আর্টিলারি	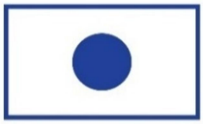
৫।	ইঞ্জিনিয়ার্স	
৬।	ব্রিজিং	
৭।	সিগন্যালস	
৮।	পদাতিক	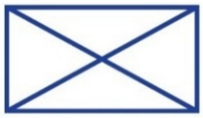
৯।	আর্মি এভিয়েশন	

আর্মস/সার্ভিসেস এর মৌলিক প্রতীক		
ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১০।	সরবরাহ ও যান	
১১।	মেডিকেল	
১২।	অর্ডন্যান্স	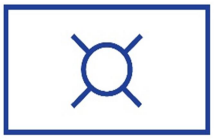
১৩।	ইএমই	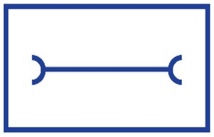
১৪।	আরভিএন্ডএফসি	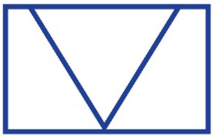
১৫।	মিলিটারী পুলিশ	

সংগঠনের আকার অনুযায়ী প্রতীক

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	সেকশন	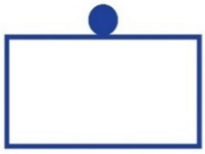
২।	প্লাটুন	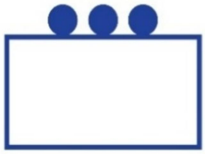
৩।	কোম্পানী	
৪।	ব্যাটালিয়ন	
৫।	ব্রিগেড	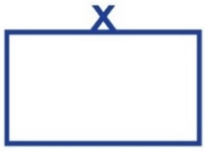
৬।	ডিভিশন	
৭।	কোর	
৮।	আর্মি	
৯।	আর্মি গ্রুপ	

প্রশাসনিক প্রতীক

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	সর্ব প্রকার গোলাবারুদ	
২।	আর্টিলারি গোলাবারুদ	
৩।	আর্টিলারি ব্যতীত সর্বপ্রকার গোলাবারুদ	
৪।	রেশন পয়েন্ট	
৫।	পানি পয়েন্ট	
৬।	বিমান বাহিনীর গোলাবারুদ	
৭।	আর্মি এভিয়েশন গোলাবারুদ	
৮।	এভিয়েশন জ্বালানী	
৯।	অন্যান্য জ্বালানী (এভিয়েশন ব্যতীত)	
১০।	এভিয়েশন জ্বালানী (আর্মি সাপ্লাই)	
১১।	এভিয়েশন জ্বালানী (এয়ার ফোর্স সাপ্লাই)	

ইলেকট্রনিক বস্তু ও উহার কার্যক্রমের প্রতীক

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	এয়ার ডিফেন্স রাডার	
২।	আর্টিলারি লোকেটিং	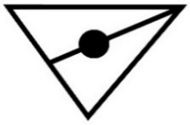
৩।	ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার	
৪।	রেডিও রিলে স্টেশন	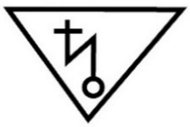
৫।	রেডিও স্টেশন	
৬।	সিগন্যাল কমিউনিকেশন	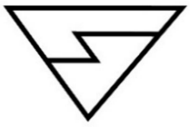
৭।	টার্গেট প্রদর্শক	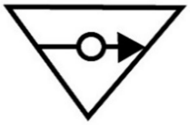
৮।	দিক নির্দেশক কেন্দ্র	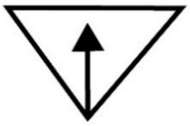
৯।	গোলযোগ সৃষ্টি কেন্দ্র (Jamming)	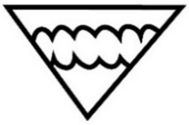
১০।	সম্প্রচার কেন্দ্র (Emitting)	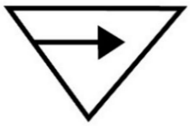

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১১।	গ্রুপ সার্ভিলেন্স রাডার/গ্রাউন্ড সেন্সর রাডার	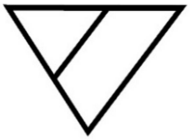
১২।	বিঘ্ন সৃষ্টিকারী (Intercepting)	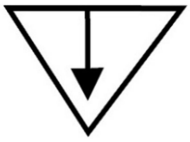
১৩।	ইলেকট্রিক টাওয়ার	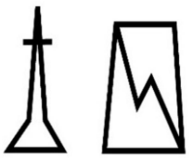

অস্ত্রশস্ত্রের প্রতীক

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	এলএমজি	
২।	গান বা হুইটজার	
৩।	মিডিয়াম গান ক্যালিবার	
৪।	হেভী গান ক্যালিবার	
৫।	হাই ট্রাজেকটরী অস্ত্র (মর্টার বা হুইটজার)	
৬।	এন্টি এয়ার ক্র্যাফট	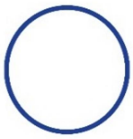
৭।	রকেট প্রজেক্টর	
৮।	মিসাইল	
৯।	ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইল	
১০।	ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইল	

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১১।	স্মোক জেনারেটর	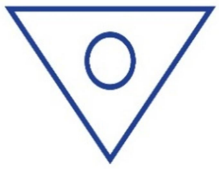
১২।	মেশিনগান	
১৩।	আরআর	
১৪।	মর্টার	
১৫।	আর্টিলারি গান	
১৬।	বিমান বিধ্বংসী কামান	

মাইনস

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	এন্টি ট্যাঙ্ক	
২।	এন্টি পারসোনাল	
৩।	বুবি ট্র্যাপড	
৪।	অজ্ঞাত মাইন	
৫।	এন্টি ট্যাঙ্ক ও এন্টি পারসোনাল দ্বারা ৬০০ মিশ্রিত মাইন বেল্ট	
৬।	বেড়াবিহীন মিশ্রিত মাইন	
৭।	লুইসেন্স বা উৎপাত করা মাইন ফিল্ড	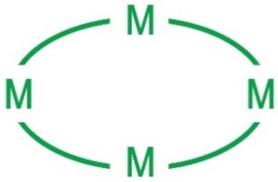
৮।	ফনি বা ধোঁকা দেওয়া মাইন	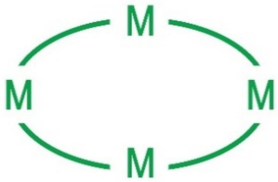
৯।	৪০০ এন্টি ট্যাঙ্ক ও এন্টি পারসোনাল মাইন গ্যাসসহ বেল্ট	

তার

ক্রমিক নং	নাম	সামরিক প্রতীক
১।	কনসারটিনা	
২।	ফেন্স	
৩।	ট্রিপ	
৪।	অনির্ধারিত ফেন্স	

ম্যাপ মার্কিং পদ্ধতি ও মার্কিং করণ

ভূমিকাঃ ম্যাপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রণক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ম্যাপ সেটিংও মার্কিং সম্পর্কে জানা অতি জরুরী।

উদ্দেশ্যঃ আজকের পাঠের উদ্দেশ্য হলো ম্যাপ সেটিং ও ম্যাপ মার্কিং সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

ম্যাপ মার্কিং এর প্রকারভেদঃ ম্যাপ মার্কিং আমরা দুই ভাবে ভাগ করে থাকি। যথাঃ

ক) সামরিক সাংকেতিক চিহ্নে মার্কিং।
খ) সাধারণ সাংকেতিক চিহ্নে মার্কিং।

ক। সামরিক সাংকেতিক চিহ্নে মার্কিংঃ যে সমস্ত সাংকেতিক চিহ্ন যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে নির্ধারিত জয়েন্ট সার্ভিস স্টাফ ডিউটি হতে পেয়ে থাকি তাকে সামরিক সাংকেতিক চিহ্নে মার্কিং বলে।

খ। সাধারণ সাংকেতিক চিহ্নে মার্কিংঃ সাধারণ ও সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা ম্যাপ মার্কিং পদ্ধতিকে সাধারণ সাংকেতিক চিহ্নে মার্কিং বলে। যেমন-গাছপালা, নদী নালা ইত্যাদি।

গ। ম্যাপ মার্কিং করার পদ্ধতিঃ ম্যাপ এর উপর বর্ণিত স্কয়ার/জিআর পূর্বে নির্ধারিত করে দেওয়ার পর সামরিক ও সাধারণ সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে ম্যাপ এর উপর ট্যাঙ্ক লাগিয়ে তাহা মার্কিং করতে হবে যাহাতে ম্যাপ নষ্ট না হয়। ম্যাপ মার্কিং করার সময় লক্ষ্য রাখিতে হবে যে সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার যেন সঠিক হয়।

ঘ। ম্যাপ সেটিং ও মার্কিং এর প্রয়োজনীয়তাঃ ম্যাপ রণক্ষেত্রে পথ চলার সাথী যাহা রণাংগুনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শান্তিকালীন সময় প্রশিক্ষণ/মহড়াতে সঠিক ও সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য ম্যাপ সেটিং ও মার্কিং এর প্রয়োজনীয়তা অত্যাদিক। যাহা বাংলাদেশ কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর সকল পদের সৈনিকদের কর্মজীবনে প্রয়োজন। তদুপরি নবাগত সৈনিকদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে ইহা ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাপ সেটিং এর প্রকারঃ ম্যাপ সেটিং আমরা দুইভাবে করে থাকি। যথাঃ

ক। নর্দিং লাইন সমান্তরাল।
খ। ইষ্টিং লাইন সমান্তরাল।

উপসংহারঃ ম্যাপ সেটিং ও মার্কিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাহা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী তাই সকলের সেই বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

একটি আদর্শ ম্যাপ মার্কিং এর চিত্রঃ

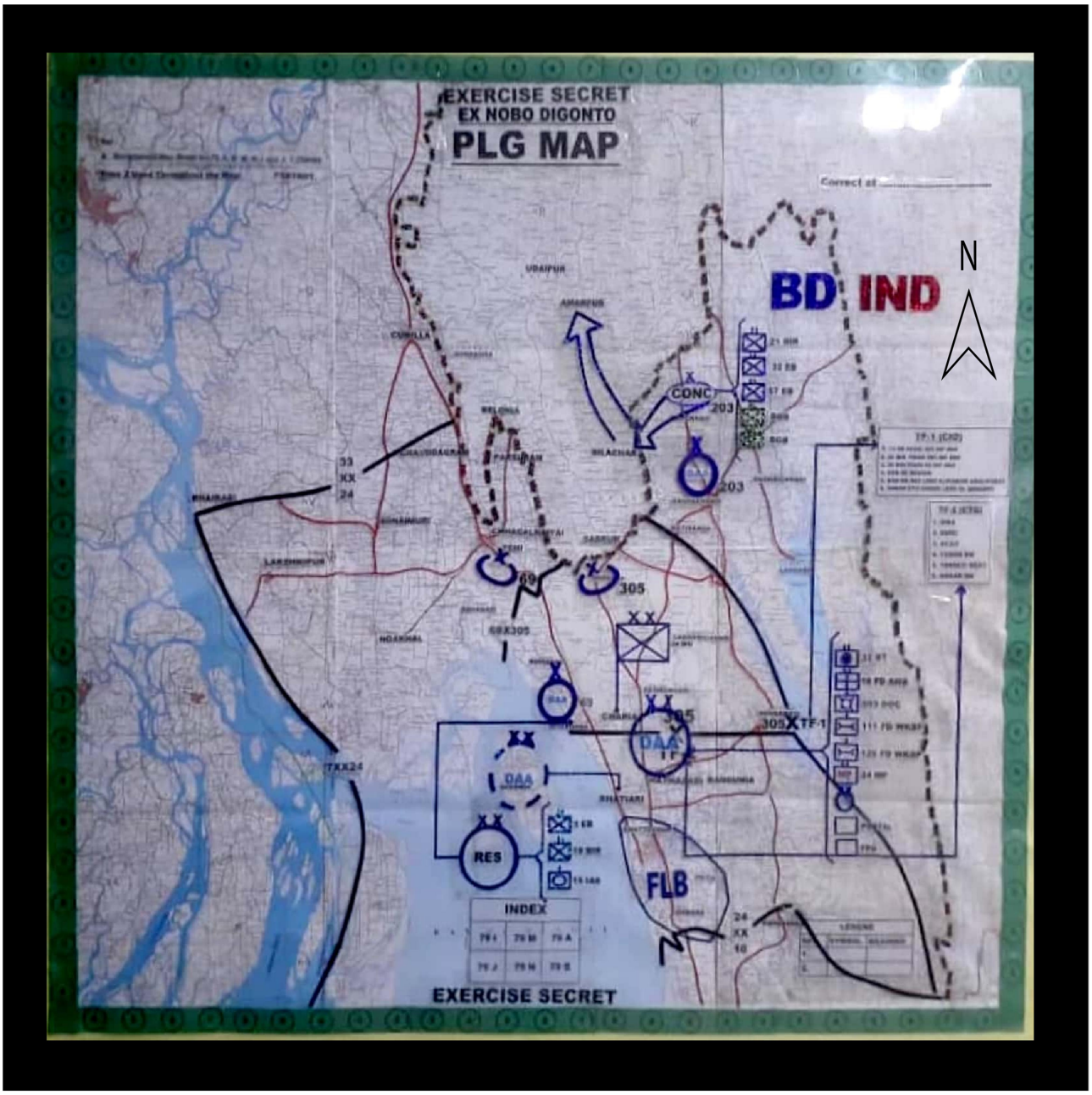

চিত্রঃ একটি আদর্শ ম্যাপ মার্কিং।

ওভারলে প্রস্তুত করণ

১। **ভূমিকাঃ** শান্তি ও যুদ্ধকালীন সময়ে পরিকল্পনার অনেক তথ্যাদি সংযোজনের প্রয়োজন হয়। অপারেশনাল কাজের জন্য ম্যাপের অংশ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য ওভারলের প্রয়োজন হয়।

২। **ওভারলের প্রয়োজনীয়তাঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে শান্তিকালীন সময় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ওভারলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই আমাদের ওভারলের উপর বিশেষভাবে তাৎক্ষনিক জ্ঞান রাখা একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রস্তুতির জন্য আমরা সচারাচর বিভিন্ন অপারেশন কালে ওভারলের উপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে থাকি। কারণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রকৌশলী হিসাবে প্রত্যেকটি ড্রাফটস্‌ম্যান ট্রেডের সৈনিকদের অপারেশনাল ম্যাপে ওভারলের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন।

৩। **সংজ্ঞাঃ** ওভারলে হচ্ছে অপারেশনাল ম্যাপের ঐ অংশ যাহা সমস্ত কিছু মার্কিং সহ বর্তমানের ন্যায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঐ ম্যাপের স্থানান্তর করাকে ওভারলে বলে।

৪। **ওভারলের উদ্দেশ্যঃ**

ক। অপারেশনাল এবং অন্যান্য যে কোন ধরনের মানচিত্র বর্তমানের ন্যায় স্থানান্তর করা।
খ। ওভারলে করার ফলে অপারেশনাল কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়।
গ। একই ম্যাপ এক স্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুত গতিতে স্থানান্তর করা যায়।
ঘ। সময় ও শ্রম কম লাগে।
ঙ। অপারেশনাল কাজ বুঝিতে সুবিধা হয়।

৫। **ওভারলের প্রকারভেদঃ** ওভারলে ৩ প্রকার। যথাঃ

ক। সফল ওভারলে।
খ। প্লান ওভারলে।
গ। প্যাট্রোল ওভারলে।

৬। **ওভারলে কেন করা হয়ঃ**

ক। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ চক্রে অনুশীলনে।
খ। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির জন্য শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণে।
গ। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির জন্য গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণে।
ক। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির জন্য প্রচলিত যুদ্ধে।

একটি আদর্শ ওভারলে এর ছক

SECURITY CLASSIFICATION (1)

EXERCISE NAME (2) COPY NO OF (6)

TYPE OF MAP (3) Annex A (7)

SUBJECT HEADING (4)

Correct at (DTG) (5)

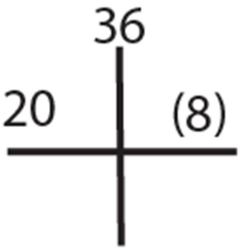

Ref: (9)

A. BANGLADESH Sheets 78/P/4 and P/5 or P/4 and 5; 1:50,000

Time Zone Used Throught the _____. FOXTROT. (10)

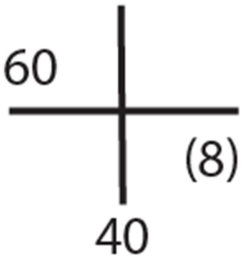

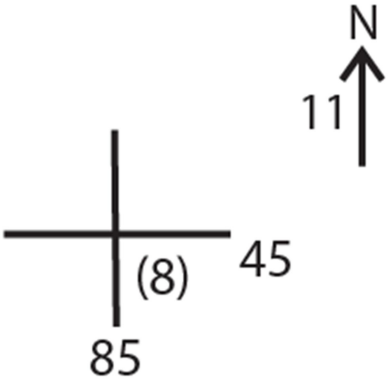

SCALE: (13)

ORBAT (12)

EN	OWN

INDEX (14)

	O	

LEGEND (15)

SER	SYMBOL	MEANING

Corresponding colour to be used

Note: Information required as applicable to marking a map, overlay and sketch are shown below by numerical:

For Map: 1,2,3,5,10,11,12,14,15
For Overlay: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,15
For Sketch: 1,2,4,6,7,10,11,13,15

৭। **উপসংহারঃ** যুদ্ধকালীন সময়ে তার উপর প্রস্তুতির জন্য এবং বিভিন্ন অপারেশনাল কাজ করার জন্য ওভারলের উপর বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে থাকি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রকৌশলী বাহিনীর সৈনিক হিসাবে ম্যাপে ওভারলের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন।

ম্যাপ সম্প্রসারণ

১। ভূমিকাঃ প্রয়োজন বোধে অনেক সময় কোন অঞ্চলের বিশদভাবে বিশ্লেষনের জন্য উক্ত অঞ্চলের ম্যাপে স্থান সংকুলন হয় না। এমতাবস্থায় ম্যাপের নির্দিষ্ট অংশের সমানুপাতিক ভাবে সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়। উক্ত কাজে অবশ্যই শুধু সাংকেতিক চিহ্নাদির সম্প্রসারনই করা হয়ে থাকে। এতে কোন নতুন তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য বড় মাপনীর স্কেচ হিসাবে একে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২। ম্যাপ সম্প্রসারণঃ কোন ম্যাপ বা এর অংশ বিশেষকে সুবিধা মত নির্দিষ্ট অনুপাতে সমানুপাতিক ভাবে বড় আকারে অংকন করাকে ম্যাপ সম্প্রসারণ বলে।

৩। প্রয়োজনীয়তা।

ক। দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো প্রাধান্য দিয়ে স্পষ্ট আকারে অংকন করা।
খ। আধুনিককরণ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করা এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দেওয়া।

ম্যাপ সম্প্রসারণ কাজটি তিন পদ্ধতিতে যে কোন একটির মাধ্যমে করা যায়। তিনটি পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য এক। যাতে নির্দিষ্ট অঞ্চলের ম্যাপ সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত কাগজ বা কাপড়ে একই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন জ্যামিতিক চিত্র অংকন করা হয়ে থাকে এবং এদের সাহায্য সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত কাগজে বর্ধিত মাপনী অনুসারে ম্যাপের বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন অংকন করতে হয়।

৪। মানচিত্র সম্প্রসারণের উপায়।

ক। বর্গক্ষেত্রের সাহায্যেঃ প্রায় সমস্ত সামরিক ম্যাপই গ্রিড পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হওয়ায় সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করার জন্য ইহাতে পূর্ব হতেই প্রস্তুত বর্গক্ষেত্র পাওয়া যায়। সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত কাগজ বা কাপড়ে নির্দিষ্ট মাপনী অনুযায়ী বর্ধিত করে প্রয়োজন অনুসারে বর্গক্ষেত্র অংকন করতঃ চোখে দেখেই সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা যায়। প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্র সমূহকে ম্যাপে ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত কাগজে বর্ধিত মাপনী অনুসারে ম্যাপের বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন অংকন করতে হয়। নিম্নে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলোঃ

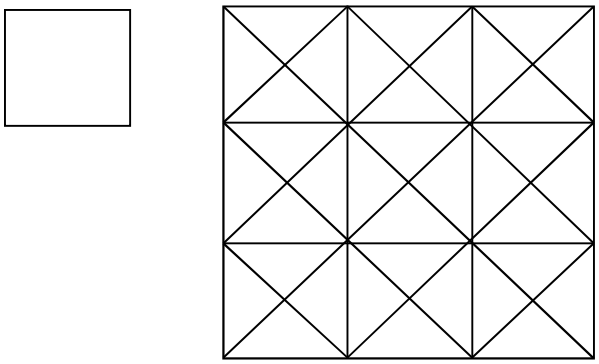

খ। বৃটিশ পতাকার সাহায্যঃ এ পদ্ধতিতে ম্যাপের গ্রিড বর্গগুলোর কর্ণ অংকন করে দিতে হবে। এতে করে নির্দিষ্ট অঞ্চলটি অনেকগুলোর ছোট ছোট ত্রিভুজে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রয়োজন বোধে কর্ণ সমূহের ছেদ্রবিন্দু গুলোকে সংযোগ করে সরলরেখা অংকন করে ও সম্প্রসারণের কাজ করা যায়। উপরোক্ত ভাবে সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত কাগজে নির্দিষ্ট মাপনী অনুযায়ী বর্ধিত করে বর্গক্ষেত্র ও ত্রিভুজ সমূহ অংকন করতে হবে।

অতএব পর যথাবিধি ম্যাপের সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। সম্প্রসারণের নির্দিষ্ট অঞ্চলের ম্যাপে বর্গক্ষেত্র অংকিত না থাকলে বা ইহা সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র না হলে ইহাতে বর্গক্ষেত্র বা চিত্র অনুযায়ী ত্রিভুজ অংকন করতে হবে। অতঃপর নির্দিষ্ট বর্ধিত মাপনী।

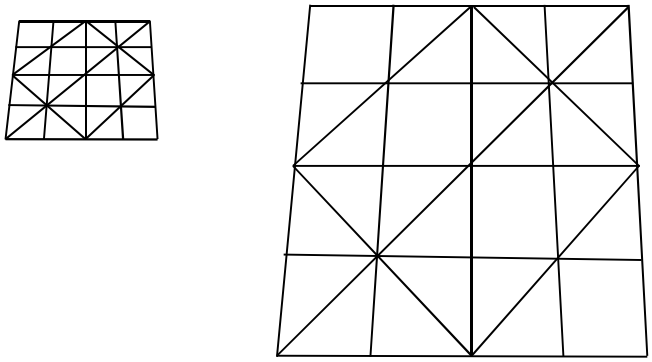

গ। <u>সমানুপাতিক বিভাজকের সাহায্যেঃ</u> সমানুপাতিক বিভাজকে এক প্রকার কাটা কম্পাস থাকে সমানুপাতিক ভাবে স্থির করে ম্যাপের সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

৫। <u>ম্যাপ সম্প্রসারণের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ</u>

ক। যেহেতু ম্যাপে সমস্ত সাংকেতিক চিহ্ন সমানুপাতিক ভাবে চিহ্নিত হয় না। সেহেতু সম্প্রসারণের সময় সকল বস্তুর সাংকেতিক চিহ্নকে নির্দিষ্ট মাপনী অনুযায়ী বর্ধিত করে অঙ্কন করতে হবে না। যেমনঃ গাছ সড়কের প্রশস্ততা ঝর্ণা ইত্যাদি ম্যাপে অংকিত সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতে হবে, ইহা দিগকে বড় করে অঙ্কন করতে হবে না।

খ। যতটুকু সম্ভব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে লেখা উচিত। সম্ভব হলে প্রথমে হালকা পেন্সিলে খসড়া ভাবে অংকন করে পরে সময়মত একে সুষ্টভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে।

গ। সমোন্নতি রেখাকে সম্প্রসারণের কাজে আকৃতিগত রেখার সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে।

ঘ। সড়ক বা রেলপথ স্কেচের শেষপ্রান্তে যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখানে নিকটবর্তী প্রশিদ্ধ স্থান বা রেলষ্টেশনের নাম ও ইহার দূরত্ব লিখতে হবে।

ঙ। সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে স্কেচের উপর অংকিত অনাবশ্যকীয় রেখাসমূহকে মুছে ফেলতে হবে।

চ। স্কেচের উপরের দিকে মাঝখানে শিরোনাম লিখে উক্ত অঞ্চলের ম্যাপশীট নম্বর ও স্থানাঙ্ক লিখতে হবে।

ছ। সাধারণ স্কেচের মত উক্ত সম্প্রসারিত স্কেচের নীচে তিন প্রকারের মাপনী প্রকাশ করে নাম, স্থান, আবহাওয়া লিখতে হবে।

জ। স্কেচের ডানদিকে পাথর্ক্যসহ উত্তর দিকেসমূহ অংকন করতে হবে।

ঝ। সর্বশেষ স্কেচের চারদিকে ম্যাপস্থ গ্রিড নম্বর লিখতে হবে।

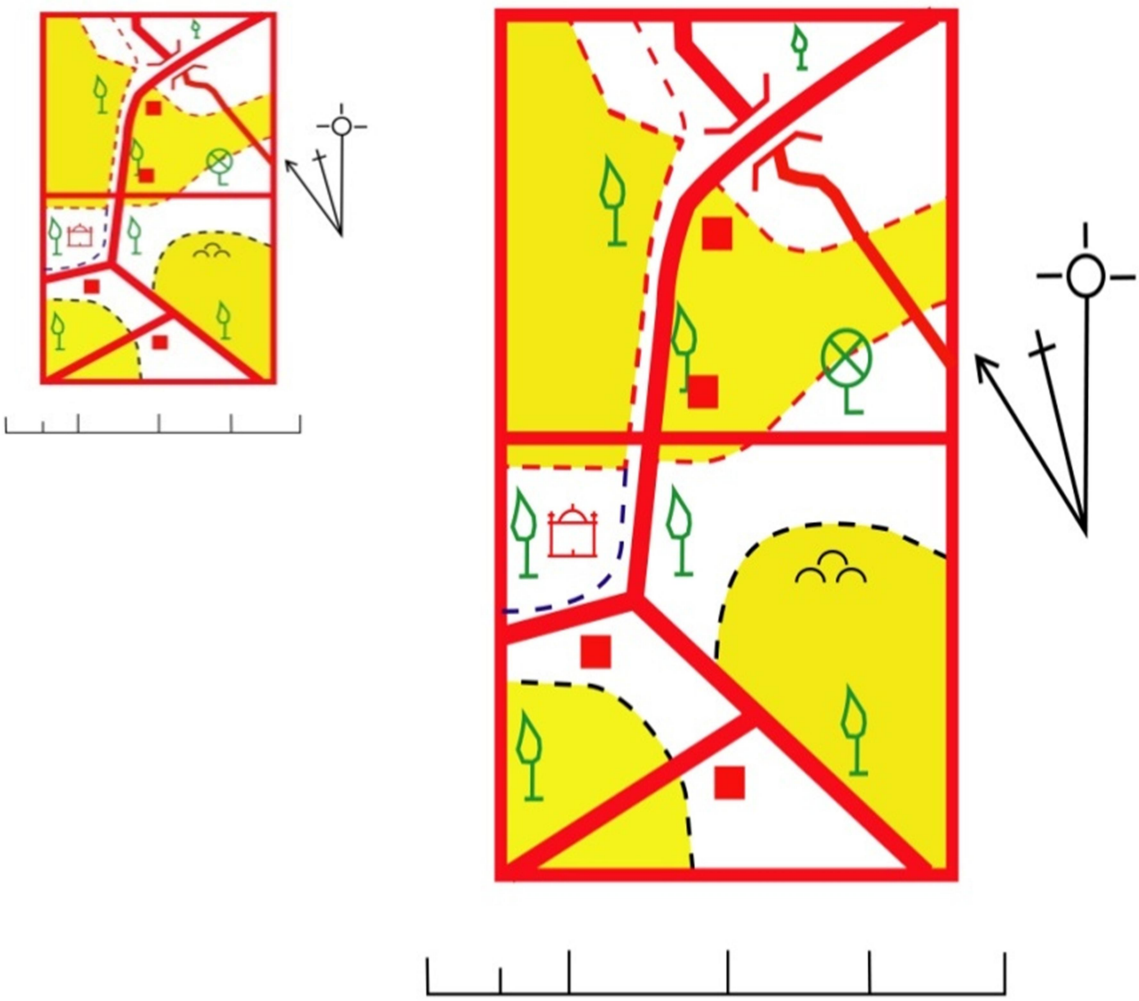

৬। ম্যাপ সম্প্রসারণের কার্য সমাপ্ত হলে অনেক সময় এতে আরো তথ্যাদি সংযোগ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত তথ্য অন্য কোন স্কেচ, বড় মাপনীর ম্যাপ বা এয়ার ফটো ইত্যাদি হতে উপরোক্ত নিয়মে নকল করা যেতে পারে। যে সমস্ত বস্তুর সাংকেতিক চিহ্ন ম্যাপে অঙ্কিত হয় নাই বা অতিরিক্ত অঙ্কিত আছে, সম্ভব হলে নির্দিষ্ট অঞ্চলে গমন করে তা সম্প্রসারিত স্কেচে শুদ্ধ করে নেওয়া উচিত।

৭। ম্যাপ সম্প্রসারণের সময় ম্যাপ হতে প্রাপ্ত বস্তু (যেমন-ঘর, পুকুর, রাস্তা, গাছ ইত্যাদি) সমূহ কালো রং, ভূমিতে পর্যবেক্ষণ করে যে সকল নতুন বস্তু (যা ম্যাপে নেই) পাওয়া যাবে তা লাল রং এবং এয়ার ফটোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বস্তু সমূহকে বেগুনী রং দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। এখানে উল্লেখ যে, ম্যাপ হতে প্রাপ্ত সকল বস্তুকে কালো রং দ্বারা প্রকাশ করার ফলে কোন কোন সময় দুটি বস্তুর সাংকেতিক চিহ্ন একই হতে পারে। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য একটিকে শুধু সীমানা রেখা দ্বারা এবং অপরটিকে ভরাট করা যেতে পারে।

৮। **উপসংহারঃ** পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মানচিত্র সম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। মানচিত্র সম্প্রসারণ সঠিকভাবে করতে পারলে মানচিত্রের নানা ছোট ছোট বস্তু যেমন ঘর-বাড়ী, রাস্তা, পুকুর, ব্রিজ ইত্যাদি সঠিকভাবে বুঝানো সম্ভব হয়। তাই মানচিত্র সম্প্রসারণ সম্পর্কে সবার জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কমান্ড পোষ্ট

১। **ডিভ কমান্ড পোষ্ট ঃ** যুদ্ধের সময় ডিভিশন কমান্ডার সংশ্লিষ্ট সহকর্মী এবং সাজ-সরঞ্জাম (প্রয়োজনীয় কাগজপত্র) সহ যে স্থান থেকে ডিভিশন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং ডিভিশনকে নিয়ন্ত্রন করে ,ঐ স্থানকে ডিভিশন কমান্ড পোষ্ট বলে।ডিভিশন কমান্ড পোষ্ট সাধারনত মাটির নিচে হয়। এর গভীরতা ১০ ফিট। প্রয়োজনে পরিবর্তন হতে পারে।

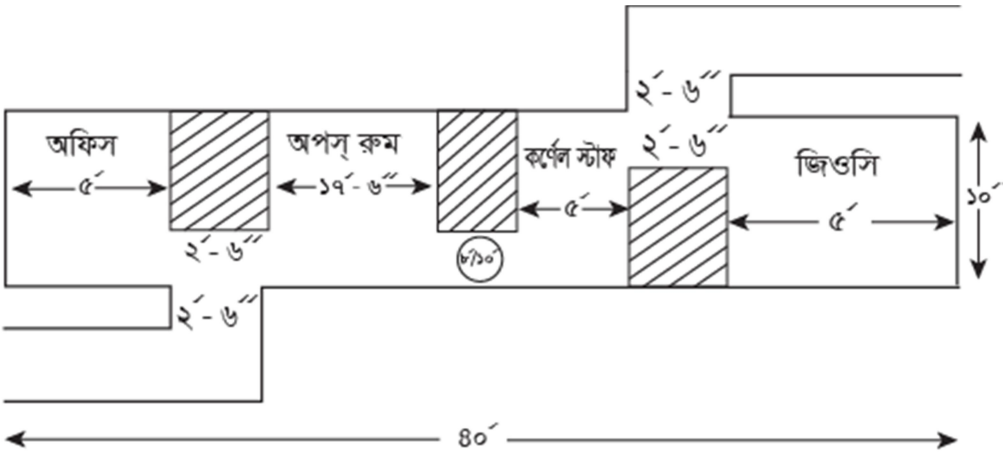

চিত্র ঃ ডিভ কমান্ড পোষ্ট।

২। **ব্রিগেড কমান্ড পোষ্ট ঃ** যুদ্ধের সময় ব্রিগেড কমান্ডার তার সহকর্মী এবং সাজ-সরঞ্জাম সহ (প্রয়োজনীয় কাগজপত্র) যে স্থান থেকে ব্রিগেড কমান্ড পোষ্ট এর যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করে তাকে ব্রিগেড কমান্ড পোষ্ট বলে। এর গভীরতা ১০ ফিট। পোষ্টকে রিভিটমেন্ট করতে হবে।

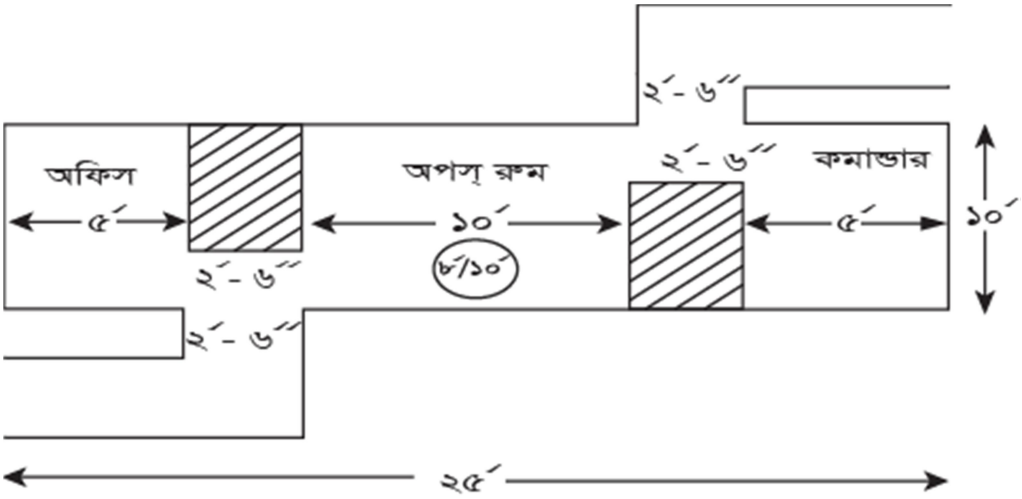

চিত্র ঃ ব্রিগেড কমান্ড পোষ্ট

৩। ব্যাটালিয়ন কমান্ড পোষ্টঃ যুদ্ধের সময় ব্যাটালিয়ন কমান্ডার তার সহকর্মী এবং সাজ-সরঞ্জামসহ (প্রয়োজনীয় কাগজপত্র) যে স্থান থেকে ব্যাটালিয়নের যুদ্ধ পরিচালনা করে ও নিয়ন্ত্রন করে, তাকে ব্যাটালিয়ন কমান্ড পোষ্ট বলে। এর গভীরতা ১০ ফিট হয়। পোষ্টকে অবশ্যই রিভিটমেন্ট করতে হবে।

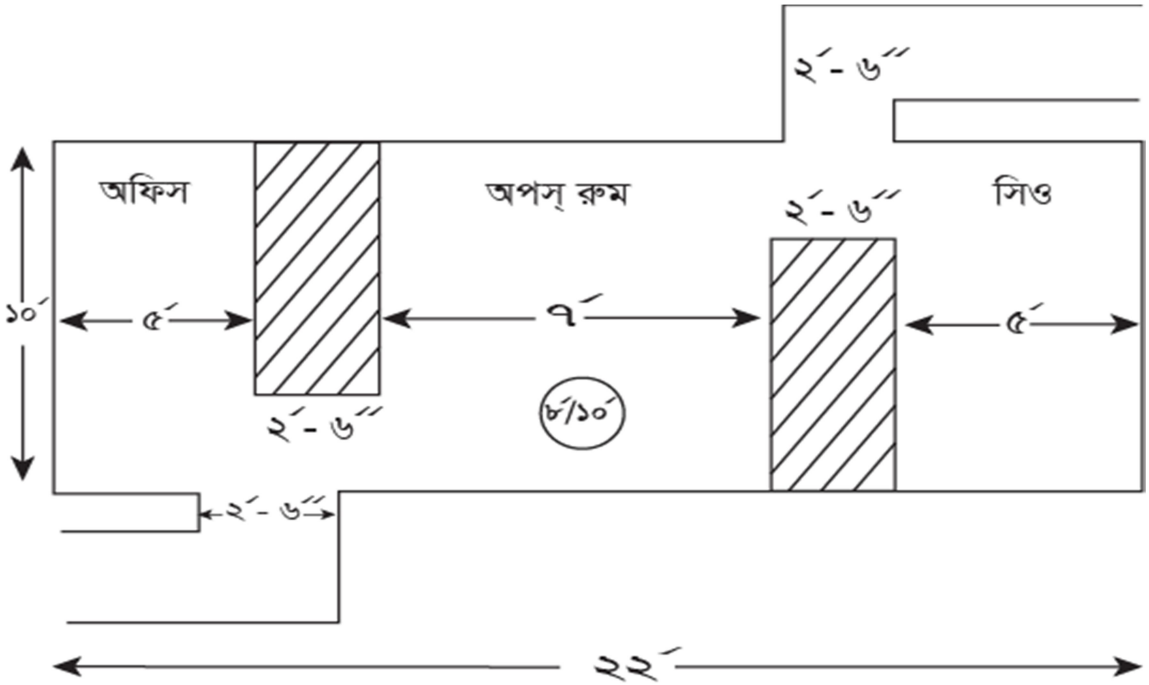

চিত্র ঃ ডিভ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন কমান্ড পোষ্ট

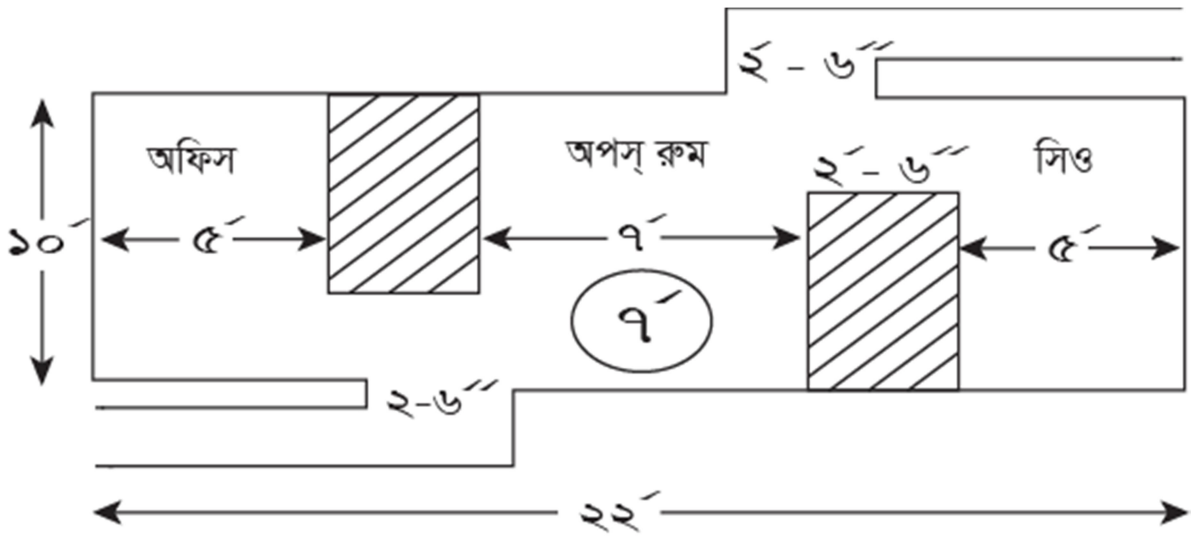

চিত্র ঃ আরই ব্যাটালিয়ন কমান্ড পোষ্ট

৪। কোম্পানি কমান্ড পোষ্টঃ যুদ্ধের সময় কোম্পানি কমান্ডর তার অধিনস্থ কমান্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য কোম্পানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে কোম্পানি কমান্ড পোষ্ট স্থাপন করা হয়।

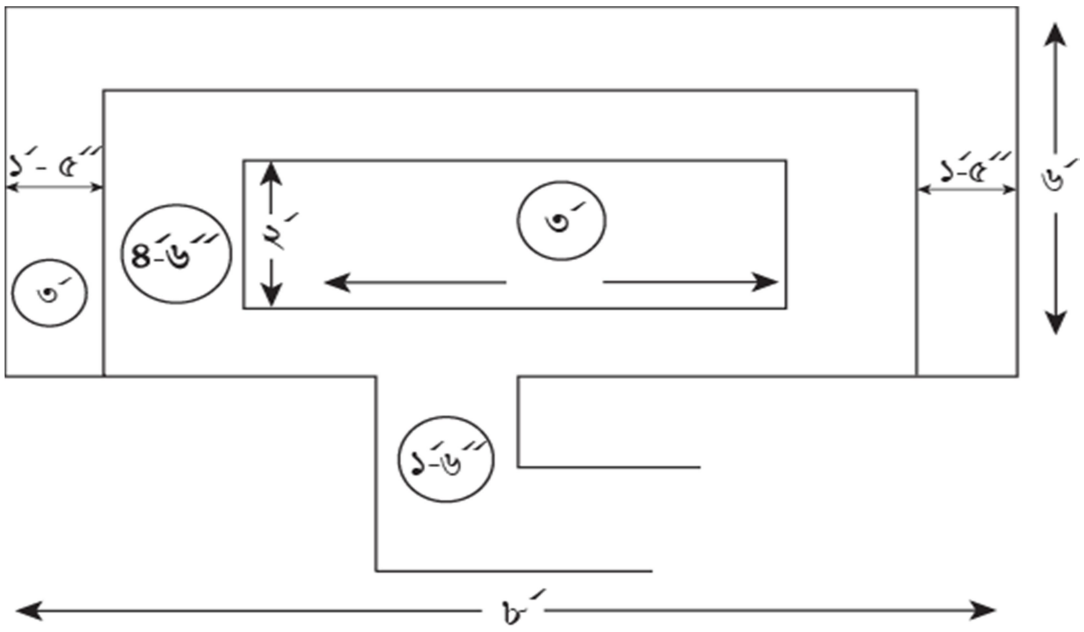

চিত্র ঃ কোম্পানি কমান্ড পোষ্ট।

৫। প্লাটুন কমান্ড পোষ্টঃ যুদ্ধের সময় প্লাটুন কমান্ডর তার অধিনস্থ সেকশন কমান্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য প্লাটুন প্রতিরক্ষা অবস্থানের মধ্যখানে সুবিধাজনক স্থানে প্লাটুন কমান্ড পোষ্ট স্থাপন করা হয়।

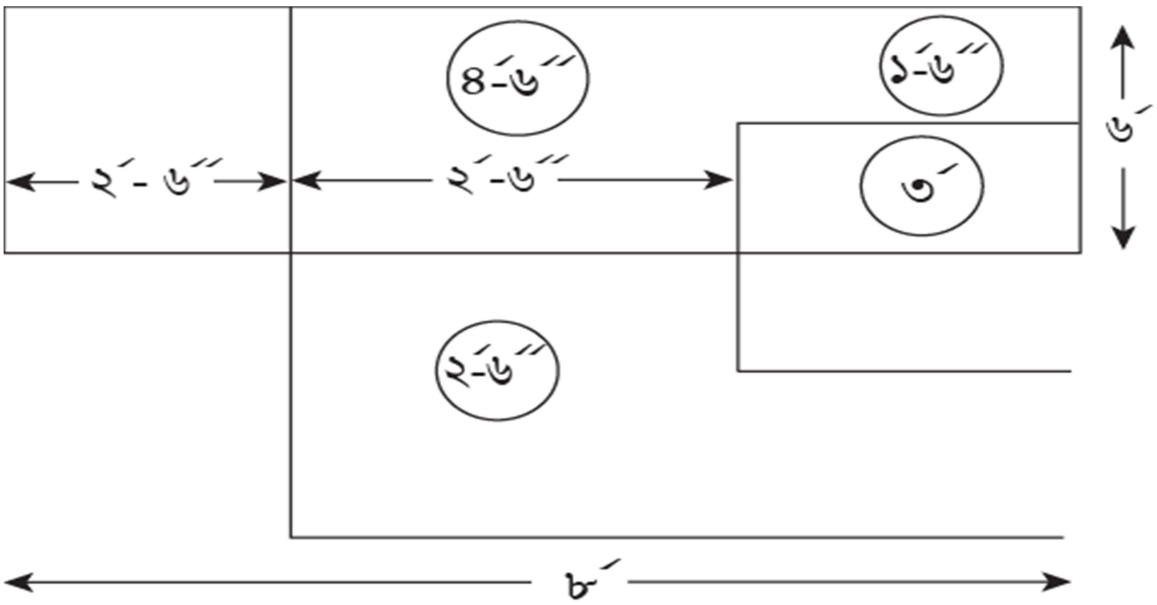

চিত্র ঃ প্লাটুন কমান্ড পোষ্ট।

ভাল প্রশিক্ষকের জন্য দক্ষতা অর্জন

১। **প্রশিক্ষকঃ** প্রশিক্ষণদানে সফলকাম হতে হলে একজন প্রশিক্ষককে অবশ্যই তার শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে এবং তারা কীভাবে লিখতে চায়, সে বিষয়ে ও তাকে সজাগ থাকতে হবে। যতদূর সম্ভব প্রশিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করবেন। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করবেন এবং সে মতে প্রশিক্ষণ দানের পরিকল্পনা করবেন।

২। **একজন প্রশিক্ষককে যে সমস্ত মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে হয় তা নিম্নরুপঃ**

ক। বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান।
খ। ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ ও ফলপ্রসুভাবে পাঠ উপস্থাপন।
গ। অধিকতর বোধগম্যতার জন্য নিজের শিক্ষাদানের ফলপ্রসুতা পরখ করা ও নিশ্চিত হওয়া এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত ভাবে জানা।

৩। **ভাল প্রশিক্ষকের গুণাবলী।**

ক। বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানঃ প্রশিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন সে বিষয় সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। এজন্য তাকে নিয়মিত লেখাপড়া করতে হবে। বিষয় সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান তাকে শিক্ষার্থীদের বিষয় সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের উত্তরদানে সহায়তা করবে।

খ। শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানঃ পাঠ উপস্থাপনার সকল পদ্ধতির জ্ঞান নিয়ে অনেকে জন্মগ্রহণ করে না। সুতরাং কীভাবে পাঠ উপস্থাপনা করতে হবে, সে সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান তাকে শিক্ষার্থীদের বিষয় সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের উত্তরদানে সহায়তা করবে।

গ। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানঃ ফলিত মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে একজন প্রশিক্ষকের জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। এ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি শিক্ষার্থীদের আচরণ ও কোন বিশেষ আচরণের কারণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন।

ঘ। কষ্ট সহিংষ্ণুতাঃ বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানলাভের পরেও সুন্দরভাবে পাঠ উপস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষককে ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, শিক্ষা সহায়ক বস্তু নির্বাচন, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সহকারী প্রশিক্ষককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান, উপস্থাপনার অনুশীলন ইত্যাদি কাজ বেশ কষ্টসাধ্য। এ সমস্ত কাজের জন্য প্রশিক্ষককে কষ্ট সহিংষ্ণুতাহতে হবে।

ঙ। উৎসাহী হওয়াঃ শিক্ষাদান একটি বৃত্তি। এ বৃত্তি সাফল্যজনক করতে হলে প্রশিক্ষককে অবশ্যই উৎসাহী হতে হবে। তাকে দায়সারা গোছের মনোভাব পরিহার করে চলতে হবে। ক্লাশকে আনন্দময় করে তুলতে প্রয়োজনে ক্লাশে রসবোধের সঞ্চার করতে হবে। অর্থাৎ তিনি শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করবেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা অধিকতর উৎসাহী হয়ে পাঠ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়।

চ। **সঠিক মনোভাব।**

১। সেনাবাহিনীতে একজন প্রশিক্ষককে তার শিক্ষর্থীদের সফলতা সম্পর্কে আগ্রহী হবে হবে। তিনি নিজের পাঠদান বিষয় এবং এর উপস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে আগ্রহী থাকবেন। প্রশিক্ষণ দানে সফলতা লাভ করতে হলে তাকে তার শিক্ষার্থীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং তা নিরসনে সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় তিনি খোলামেলা থাকবেন।

২। প্রশিক্ষণ পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন প্রশিক্ষক নিয়মিত অধ্যয়ন দ্বারা নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবেন এবং শিক্ষাদানকে উন্নততর করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

৩। শ্রেণিকক্ষে একজন প্রশিক্ষক যা কিছু করেন তাতে শিক্ষার্থীদের প্রতি, বিষয়ের প্রতি এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রতি তার মনোভাব পরিস্ফূটিত হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষককে অনুসরণ করতে পছন্দ করে। তাই প্রশিক্ষকের মনোভাবের ছাপ শিক্ষার্থীর মনেও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রতি প্রশিক্ষকের সঠিক মনোভাব থাকতে হবে।

ছ। কৌশলী হওয়াঃ বিভিন্ন পরিবেশ হতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়। পূর্বলব্ধ জ্ঞান সকলের সমান নয়। মানসিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্য তাদের আচরণও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের বিভিন্নমুখী শিক্ষার্থীদেরকে একই পাঠের আওতায় এনে প্রশিক্ষণ প্রদানে একজন প্রশিক্ষককে অবশ্যই কৌশলী হতে হবে।

জ। ভাল বক্তা হওয়াঃ বাকশক্তির কলা কৌশল প্রয়োগ করে একজন প্রশিক্ষক অবশ্যই ভাল বক্তা হবে। বক্তৃতার সময় প্রশিক্ষককে প্রধান প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বক্তব্য আনন্দায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক হতে হবে। পাঠদানের সময় প্রশিক্ষককে স্বাভাবিক থাকতে হবে।

ঝ। অনুকরণীয় বা উদাহরণ স্বরূপ হওয়াঃ চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছদ মোট কথা প্রতিটি বিষয়ে প্রশিক্ষককে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষার্থীরা অনুকরণ প্রিয়। তাই প্রশিক্ষককে উপরোক্ত গুণাবলীতে নমুনাস্বরূপ হতে হবে যা শিক্ষার্থী কর্তৃক অনুকরণীয় হবে।

ঞ। ধৈর্যশীল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াঃ প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। অধিক পরিশ্রমে ধৈর্য হারা না হয়ে প্রশিক্ষককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

চ। আত্নবিশ্বাসী হওয়াঃ বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, সঠিক পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু উপস্থাপনার জন্য রিহার্সেল একজন প্রশিক্ষককে আত্নবিশ্বাসী করে তোলে। উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করে প্রশিক্ষককে আত্নবিশ্বাসী হতে হবে।

৪। শিক্ষাদানের বিভিন্ন স্তর।

ক। প্রস্তুতি পর্বঃ শিক্ষার্থীদের সামনে সুন্দরভাবে পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রশিক্ষককে ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পাঠের উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রশিক্ষক আনুষঙ্গিক উপরকরণ বা সহায়ক বস্তু সংগ্রহ করবেন এবং প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করে প্রস্তুত রাখবেন। এরপর পাঠ উপস্থাপনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নির্বাচন করে প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণের নীল নকশা স্বরূপ পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য বিষয়টি বারবার উচ্চ কণ্ঠের মাধ্যমে আবৃত্তি করে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। বিষয়বস্তু প্রস্তুতের সময় প্রশিক্ষককে সর্বদা শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে সর্বাধিক শিক্ষাদানের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। সুন্দর প্রস্তুতি প্রশিক্ষকের মনে আত্নবিশ্বাসের জন্ম দেবে এবং সফলতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রস্তুতি পর্বে যত ভূলত্রুটি আছে তা দূর করতে হবে এবং আরও উল্লেখ্য যে, পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে প্রস্তুতি যত ভাল ও নিখুঁত হবে, পাঠ উপস্থাপন তত সুন্দর হবে।

খ। <u>উপস্থাপনা পর্বঃ</u> প্রকৃত শিক্ষাদান শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব হতে অর্থাৎ উপস্থাপনা পর্ব হতে। এ স্তরে প্রশিক্ষককে শিক্ষার্থীর সামনে পাঠ উপস্থাপন করতে হয়। প্রশিক্ষককে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে কেন ও কী উদ্দেশ্যে তারা পাঠ গ্রহণ করবে এবং সমগ্র পাঠের বিভিন্ন অংশ এ পর্বে আলোচনা করা হয়। এ স্তরেই প্রশিক্ষকের প্রস্তুতির যথার্থতা যাচাই হয়। ফলে উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করলে উত্তম উপস্থাপনা নিশ্চিত হয়। প্রশিক্ষকের ব্যক্তিগত অবয়ব, প্রকৃত কথাবার্তা এবং সুদক্ষ শ্রেণি পরিচালনা সফলভাবে পাঠ উপস্থাপনে তাকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করবে। যে সমস্ত উপায়ে প্রশিক্ষক উপস্থাপন করতে পারেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(১) বক্তৃতা।
(২) পাঠ পদ্ধতি।
(৩) আলোচনা/কনফারেন্স।
(৪) প্রদীপন।
(৫) উপরোক্ত যে কোন দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণ।

গ। <u>প্রয়োগ পর্বঃ</u> এ স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করার, কথা বলার, লেখার ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হয় এবং প্রশিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কার্যবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। সুতরাং শিক্ষার্থীরা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা প্রশিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। প্রয়োজনীয় মান অর্জনে এবং পর্যবেক্ষণে এটা সহায়তা করে। কারণ প্রশিক্ষকগণ এ পর্বে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে অনুশীলন করার ও তাদের ভূলত্রুটি সংশোধন করেন।

ঘ। <u>নিশ্চয়তা বিধান পর্বঃ</u> যে পর্বে শিক্ষার্থীর অনুধাবন, ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতা যাচাই করা হয় তাই নিশ্চয়তা বিধান পর্ব। সমস্ত পাঠে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিক্ষা লাভ করলো, শিক্ষণে কারো কোন অসুবিধা রয়েছে কিনা ইত্যাদি খুঁজে বের করাই হলো এ পর্বের উদ্দেশ্য, এটাকে পরীক্ষাও বলা যায়। প্রয়োগ পর্বও অনেকটা এর মতই। তবে এর সাথে মৌলিক পার্থক্য হলো যে, প্রয়োগ পর্বে শিক্ষার্থীদের পথ নির্দেশ করা হয় অর্থাৎ তারা যখন কাজ করতে থাকে তখনই তাদেরকে ভূলত্রুটি নির্দেশ ও সংশোধন করা হয় না। কারণ এটা পরীক্ষা।

ঙ। <u>পর্যবেক্ষণ/আলোচনা/পুনরালোচনাঃ</u> শিক্ষার্থীর জ্ঞান পর্যবেক্ষণ করার জন্য এ স্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সাহায্যে শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এটা সর্বদা প্রয়োগ ও নিশ্চিতকরণ পর্বের পরেই সংঘটিত হয়। যে সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনার সময় ভালভাবে উপলদ্ধি করতে পারেনি সেই সমস্ত বিষয়ের পুনঃ ব্যাখ্যা এ স্তরে দেয়া হয়। কোন সময় প্রশিক্ষককে সম্পূর্ণ পাঠটিকে পুনরালোচনা করতে হয়, ফলে বিভিন্ন প্রকার শূন্যতার পরিপূরণ এ স্তরে সংঘটিত হয়।

৫। <u>সুন্দর শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ।</u>

ক। <u>নিয়মানুবর্তিতাঃ</u> প্রশিক্ষণ যথাসময়ে শুরু ও শেষ হতে হবে। যথাসময়ে প্রশিক্ষণ শুরু না হলে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং যথাসময়ে ক্লাশ শেষ না হলে তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট বিষয়ের গুরুত্ব কমে যায়, আবার প্রশিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

খ। <u>শারীরিক সুস্থতাঃ</u> শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা বা আরাম/বিশ্রাম তার শিক্ষা গ্রহণের বড় রকমের সহায়ক। শিক্ষার্থী অনাহারে থাকলে অথবা কনকনে শীত বা প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুতেই তাকে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলা যাবে না। এর অর্থ এ নয় যে, সৈনিক বা শিক্ষার্থীকে খুবই আরামে রাখতে হবে। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের খাতিরে প্রশিক্ষক শুধু এতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিশ্চিত হবেন যে, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছে। শিক্ষার্থীগণ যখন মানসিক কাজে ব্যস্ত থাকবে তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হয়।

গ। <u>চিত্তবিক্ষেপ বা হতবুদ্ধিঃ</u> পাঠদানকালে প্রশিক্ষককে তার শ্রেণি পরিচালনার স্থান সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। উক্ত স্থান জনপদের নিকটে হবে না। এতে চলাচলকারী জনপদের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শ্রেণি পরিচালনার স্থান সর্বদা বাহ্যিক কোলাহলমুক্ত শান্ত পরিবেশে হতে হবে। চিত্তবিক্ষেপকারী বস্তু সর্বদা শিক্ষার্থীর দৃষ্টির বাইরে থাকবে।

ঘ।<u>প্রশিক্ষকের অবস্থানঃ</u> পাঠদান কালে শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষক এমন স্থানে দাঁড়াবেন বা অবস্থান করবেন যেখানে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাকে ভালভাবে দেখতে পায় এবং তার কথা শুনতে পায়। এজন্য গৃহাভ্যন্তরের শ্রেণিকক্ষে তিনি মঞ্চের উপর দাঁড়াবেন এবং বহিরঙ্গণে শ্রেণিকক্ষে ঢিবি বা উঁচু স্থানের উপর দাঁড়াবেন। প্রশিক্ষকের স্থান শিক্ষার্থীদের তুলনায় নীচু এলাকায় হলে তিনি অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থান করবেন।

ঙ। <u>প্রশিক্ষকের কর্তব্যসমূহঃ</u> শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য সকল প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুসরণ করতে হয়। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষককে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব অসুবিধা নিজের সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে সমাধান করতে হবে।

৬। **শ্রেণিকক্ষে কর্তব্যসমূহ নিম্নরুপ।**

ক। **পাঠদানের প্রারম্ভেঃ**

(১) আসন ব্যবস্থা, আসন পরিকল্পনা ও নামের তালিকা।
(২) বায়ু চলাচল ও আলোর ব্যবস্থা।
(৩) সাধারণ পরিচ্ছন্নতা ও শ্রেণিকক্ষের অবস্থা।
(৪) শিক্ষা সহায়ক বস্তু ব্যবহারের জন্য যথাস্থানে প্রস্তুত আছে কিনা।
(৫) হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, নির্দেশক কাঠি পরীক্ষা করা।
(৬) সহকারী শিক্ষক মনোনীত করা এবং তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত আছে কিনা পরীক্ষা করা।
(৭) বহিরঙ্গণে শ্রেনী পাঠের সময় বায়ু প্রবাহের দিক ও সূর্যের অবস্থান ইত্যাদি লক্ষ্য করা।
(৮) পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
(৯) ব্যক্তিগত আচরণ ও অঙ্গভঙ্গির প্রতি সজাগ থাকা।

খ। **পাঠদানের সময়ঃ**

(১) প্রশিক্ষক স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবেন।
(২) শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।
(৩) শিক্ষার্থীদের নাম ধরে সম্বোধন করবেন।
(৪) স্বাভাবিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।

গ। **পাঠদান শেষেঃ**

প্রশিক্ষক হোয়াইট বোর্ড পরিস্কার করবেন। শিক্ষাসহায়ক বস্তুসমূহ যথাস্থানে রাখবেন এবং এমন অবস্থায় শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন যাতে পরবর্তী প্রশিক্ষক শ্রেণিকক্ষ প্রাথমিক অবস্থায় যেমন ছিল তেমনটি পেতে পারেন।

বিবিধ

AWOL	-	Absent Without Leave
ADJT	-	Adjutant
ATT	-	Advance Trade Training
ADOC	-	Air Defence Operations Centre.
APR	-	Annual Performance Report.
AHQ	-	Army Headquarters.
ASU	-	Army Security Unit.
BAF	-	Bangladesh Air Force.
BMTF	-	Bangladesh Machine Tools Factory.
BNCC	-	Bangladesh National Cadet Corps.
BOF	-	Bangladesh Ordnance Factory.
BUP	-	Bangladesh University of Professionals.
BMR	-	Basic Map Reading.
BTT	-	Basic Trade Training.
BGB	-	Border Guard Bangladesh.
CSD	-	Canteen Stores Department.
CANTT	-	Cantonment.
CPU	-	Central Processing Unit.
CAP	-	Combat Air Patrol/Coy Aid Post.
CMH	-	Combined Military Hospital.
CPX	-	Command Post Exercise.
D Engrs	-	Director Engineers.
DGFI	-	Directorate General Forces Intelligence.
DGMS	-	Directorate General Medical Service.
DAA	-	Divisional Administrative Area.
BAA	-	Bradge Administrative Area.
ENGR	-	Engineers.
FIU	-	Field Intelligence Unit.
FPO	-	Field Post Office.
FSMO	-	Field Service Marching Order.
FTX	-	Field Training Team.
FCI	-	Fire Control Instrument.
FDL	-	Forward Defended Locality/Line.
GPS	-	Global Positioning System.
GO	-	Government.

GPA	-	Grade Point Average.
IPFT	-	Individual Physical Fitnees Test.
ICU	-	Intensive Care Unit.
LRA	-	Leave Ration Allowance.
MP	-	Military Police.
OBC	-	Officers Basic Course.
OGT	-	Operational Group Training.
OR	-	Other Rank (s).
ORBAT	-	Order of Battle.
OSL	-	Over Staying Leave.
RAF	-	Rapid Action Force.
RAB	-	Rapid Action Battalion.
RAP	-	Regiment Aid Post.
SL	-	Search Light.
SKS	-	Sena Kalyan Shangstha.
SVY	-	Survey.
TO&E	-	Table of Organization and Equipment.
MIST	-	Military Institute of Science and Technology.
AOR	-	Area of Responsibility.
CAS	-	Chief of Army Staff.
ACK	-	Action.
DML	-	Demolish.
EOD	-	Explosive Ordanance Disposal.
ERE	-	Extra Regimental Employment.
ISSB	-	Inter Services Selection Board.
P Lve	-	Privilege Leave.
R Lve	-	Recreation Leave.
QRF	-	Quick Reaction/ Responce Force.
SOP	-	Standing Operating Procedure.
FP	-	Finising Point.
SP	-	Starting Point.
ST	-	Summer Training.
TF	-	Task Force.
WWW	-	World Wide Web.